মুরাদুল মুরীদীন

مُرَادُ الْمُرِيْدِيْنَ

(মুরীদের উদ্দেশ্য)

মূল

আলহাজ্জ হযরত মাওলানা শাহ কারামত আলী

জৌনপুরী

প্রকাশনায়

মৌলানা মুহম্মদ ফুজেল জৌনপুরী বিশ শেখুত ব

তরীকত মৌলানা গালিব হুসাইন জৌনপুরী

(মারকাজ তালিব উল উলুম)

মুল্লা টোলা জৌনপুর ভারত

মুরাদুল মুরীদীন

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

মুরাদুল মুরীদীন

مُرَادُ الْمُرِيْدِيْن

(মুরীদের উদ্দেশ্য)

মূল

আলহাজ্জ হযরত মাওলানা শাহ কারামত আলী জৌনপুরী (রহঃ)

অনুবাদ

মাওলানা এ, বি, এম, সালাহ্ উদ্দীন লক্ষয় এম. এম.

প্রকাশনায়

মৌলানা মুহম্মদ ফুজৈল জৌনপুরী বিশ শেখুত তরীকত মৌলানা গালিব হুসাইন জৌনপুরী

ঠিকানা

গালিব মান্জিল মুল্লা টোলা জৌনপুর ভারত

+918960084528

(মারকাজ তালিব উল উলুম)

হযরত মাওলানা শাহ্ কারামত আলী জৌনপুরী (রহঃ)-এর

সংক্ষিপ্ত জীবনী[1]

বারশত পনের হিজরীর মুহার্‌রম মাসের আঠার তারিখে শেষ যামানার হাদী, মুর্শিদে বরহাক আমীরুল মু'মিনীন আলহাজ্ব হযরত মাওলানা শাহ্ কারামত আলী সাহেব জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা হযরত মাওলানা আবূ ইবরাহীম শায়খ ইমাম বখশ (রহঃ) একজন তাপস ও অত্যন্ত বুযুর্গ লোক ছিলেন।

হযরত মাওলানার আসল নাম ছিল আলী। তাঁহার রচিত কিতাবসমূহে তিনি লিখিয়াছেন, "আলী জৌনপুরী" কোন কোন কিতাবে "আলী জৌনপুরী মাশহূর কারামত আলী"।

যেহেতু তাঁহার হেদায়েত কালে অসংখ্য কারামত বা অলৌকিক ঘটনাবলী সর্বজনবিদিত তাই তাঁহার নাম কারামত আলী হইয়াছে। আল্লাহ তাআলা পয়গাম্বরগণকে সময়োপযোগী গুণরাজীতে বিভূষিত করিয়াছিলেন। যেমন- হযরত মূসা (আঃ)-এর যামানায় জনসাধারণ যাদুতে বিশ্বাসী ছিল এবং যাদুকরগণই সমাজের উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিল। তাই আল্লাহ্ তাআলা হযরত মূসা (আঃ)-এর লাঠিতে এমন অলৌকিক গুণ দিয়াছিলেন যদ্দ্বারা তিনি তৎকালীন বিখ্যাত যাদুকরগণকে পরাস্ত করিয়া নিজেকে আল্লাহ্‌র রাসূল বলিয়া প্রমাণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। হযরত ঈসা (আঃ)-এর যামানায় চিকিৎসাশাস্ত্র উন্নতির উচ্চশিখরে আরোহণ করিয়াছিল সত্য, কিন্তু দুরারোগ্য কুষ্ঠ রোগের চিকিৎসা তখনও অসম্ভব ছিল। তাই আল্লাহ্ তাআলা তাঁহাকে এমন গুণই দিয়াছিলেন যে, যে কোন প্রকারের কুষ্ঠ রোগই তিনি স্পর্শ করা মাত্রই আরোগ্য হইত। এই অলৌকিক শক্তি বলেই তিনি তৎকালে নবীরূপে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে পারিয়াছিলেন।

টীকা ১ ঃ বিভিন্ন গ্রন্থাবলী হইতে সাহায্য লইয়া অত্র কিতাব প্রকাশক কর্তৃক হযরত আলহাজ্ব মাওলানা শাহ কারামত আলী জৌনপুরী (রহঃ) এর এই সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়াছে।

হযরত মাওলানা মারহুম মাগফুর সাহেবের যামানায় এতদ্দেশে যাদু, টোনা, হিপনোটিজম, মেছমেরিজম, এছতেদরাজ ইত্যাদি অলীক ও আশ্চর্যজনক কার্য দ্বারা অজ্ঞ মানুষকে নানাধরনের ভণ্ড তাপস্যিদল বিপদে ফেলিত। এই পতিত সমাজের উদ্ধারের জন্যই করুণাময় আল্লাহ্ তাআলার অনুগ্রহে হযরত মাওলানা সাহেব এই দেশে তাশরীফ আনিয়াছিলেন। আল্লাহ্ তাআলা তাঁহাকে এমন অলৌকিক শক্তি দিয়াছিলেন যে, তাঁহার সমস্ত কাজের ভিতর দিয়াই সেই শক্তির পূর্ণ বিকাশ হইয়াছিল। তিনি ছিলেন আল্লাহ্‌র অলী, যাহেরী ও বাতেনী ইল্‌মের গভীর সমুদ্র এবং তাঁহার প্রত্যেক অলৌকিক কার্যই ছিল খাঁটি, তাহাতে কাহারও মনে সন্দেহের লেশমাত্রও উদ্রেক হইত না। তাঁহার সমস্ত কার্যই কারামত বিশিষ্ট ছিল বলিয়া তাঁহার পবিত্র নাম আলীর সঙ্গে কারামত শব্দ যোগ দিয়া তাঁহাকে জনাব মাওলানা কারামত আলী নামে অভিহিত করা হয়।

তাঁহার কারামত প্রসঙ্গে এখানে একটি কারামতির উল্লেখ করা যাইতে পারে— তিনি একটি চাউলের উপর 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' সহ পুরা 'কুলহুওয়াল্লাহ্' সূরাটি লিখিয়া নিজের নাম দস্তখত করিতেন। তাহা সকলে পরিষ্কারভাবে পড়িতে পারিত এবং এই চাউল সেবনে যে কোন দুরারোগ্য রোগ আরোগ্য হইত।

তাঁহার (জনাব মাওলানা সাহেবের) কারামত সম্পর্কে আরও অনেক তথ্য বিভিন্ন কিতাবাদিতে পাওয়া যায় যাহা কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় এই ছোট রিসালায় উল্লেখ করা হইল না।

হযরত মাওলানা শাহ্ কারামত আলী (রহঃ) সাহেব অতি শৈশব হইতেই সংযত ও গম্ভীর প্রকৃতির ছিলেন। বাল্যকালে খেলা-ধুলা, রং-তামাশা ইত্যাদি বাল্যজীবনের স্বাভাবিক চরিত্র হইতে তিনি পবিত্র ছিলেন। তিনি অল্প বয়স হইতেই নামায, রোযা ইত্যাদি ফরয ও ওয়াজিব কার্যাবলীর বড়ই পাবন্দ ছিলেন এবং তখন থেকেই বুযুর্গ লোকদের নিকট গমন করিতেন, তাঁহাদের সঙ্গে উঠা-বসা করিতেন। বাল্যকালেই তাঁহার মেধাশক্তি অতীব তীব্র ছিল। তাঁহার স্মরণ শক্তি বা "কুওয়াতে হাফেজা" এত তীব্র ছিল যে, তিনি যে কথা একবার শুনিতেন উহা কখনও ভুলিতেন না এবং যাহা একবার পড়িতেন উহা দ্বিতীয়বার পড়িবার আবশ্যক হইত না। তাঁহার এই মেধাশক্তি দর্শনে উস্তাদগণ অত্যন্ত আশ্চার্যান্বিত হইয়া

পড়িয়াছিলেন। হযরত মাওলানার পাঁচ বৎসর বয়সে তাঁহার পিতা হযরত মাওলানা আবূ ইবরাহীম সাহেব স্বীয় বংশের নিয়ম অনুসারে "আমপারার" সবক দিলেন। হযরত মাওলানা আল্লাহ্ প্রদত্ত অসাধারণ মেধাশক্তি বলে এক সপ্তাহের মধ্যেই সম্পূর্ণ আমপারা মুখস্থ করিয়া ফেলিলেন। তিনি সাত বৎসর বয়স হইতেই নামাযের এতবড় "পাবন্দ" ছিলেন যে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ও জুমুআর নামায মসজিদে যাইয়া আদায় করিতেন এবং সুন্নাত ও নফল পড়িয়া নির্জনে চক্ষু বন্ধ করিয়া আল্লাহ্‌র ধ্যানে বসিয়া থাকিতেন। তাঁহার পোশাক-পরিচ্ছদ অত্যন্ত সাধারণ ছিল। বাল্যকাল হইতেই তিনি সুন্নাতে নববীর প্রতি বিশেষ যত্নবান ছিলেন। ৭/৮ বৎসর বয়সের ছেলের এই সকল গুণরাজী দেখিয়া সকল লোক আশ্চার্যান্বিত হইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার দশ বৎসর বয়সকালেই এতীম, বিধবা, অনাথ ও মিসকীনদের সেবাকে জীবনের প্রধান অলঙ্কাররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। যদি কোন বাড়ীতে পানির কষ্ট হইতেছে বলিয়া শুনিতেন, তখন তিনি স্বয়ং মোশক ভরিয়া তথায় পানি দিয়া আসিতেন। মোটকথা তিনি বাল্যকাল হইতেই হযরত বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চরিত্রের অনুসারী ছিলেন।

হযরত মাওলানা স্বীয় পিতার নিকট দশ বৎসর বয়স পর্যন্ত "ত্রিশ পারা কোরআন" হেফজ করেন, ফার্সী ভাষায় পারদর্শী ও হস্তলিপিতে অদ্বিতীয় ক্ষমতা প্রাপ্ত হন।

অতঃপর সেই যুগের বিখ্যাত আলেমগণের নিকট উপস্থিত হইয়া বিভিন্ন শাস্ত্রে বুৎপত্তি লাভ করেন। তিনি নিম্নলিখিত আলেম ও বিদ্বানগণের নিকট হইতে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষালাভ করেন ঃ

উস্তাদগণের নাম ঃ	যে বিষয় শিক্ষা লাভ করিয়াছেনঃ
১. মাওলানা কুদরত উল্লাহ রুদলবী (রহঃ) হইতে	[ধর্মবিষয়ক বিদ্যা]
২. মাওলানা আহাম্মদ উল্লাহ থানভী (রহঃ) হইতে	[হাদীস]
৩. মাওলানা আহাম্মদ আলী চেরিয়া কুঠি সাহেব হইতে	ইলমে মাকুলাত
৪. ক্বারী সৈয়্যদ ইবরাহীম মাদানী (রহঃ) ও	
৫. কারী সৈয়্যদ মোহাম্মদ ইসকান্দারনী (রহঃ)	[ইলমে তাজ্‌বীদ]

পরবর্তীকালে ইলমে তাজ্‌বীদ সম্পর্কে হযরত মাওলানা শাহ্ কারামত আলী (রহঃ) বহু কিতাব লিখিয়াছেন। ইলমে তাজবীদ বিষয়ে তাঁহার প্রণীত কিতাব মাখারিজুল হুরূফ, শরহে জজ্‌বী হিন্দী, যীনাতুল কারী, কাওকাবে দুররি লোকসমাজে এতই আদরণীয় হইয়াছে যে আজ পর্যন্ত উহা পাঠ্য তালিকাভুক্ত হইয়া চলিয়াছে।

হযরত মাওলানা হাফেজ আবদুল আউয়াল জৌনপুরী (রহঃ) তাঁহার প্রণীত আহসানুত তাওয়াবীল নামক কিতাবে লিখিয়াছেন যে, "আমি উপরোল্লেখিত কিতাবসমূহ মক্কা শরীফেও পাঠ্য তালিকাভুক্ত দেখিয়াছি।"

হযরত মাওলানা সাহেব ৭ প্রকারে লিখিতে পারিতেন। তিনি বহু লোককে লিখন-বিদ্যা শিক্ষা দিয়া সুলেখক করিয়াছিলেন। তাঁহার লিখিত আরবী পুস্তকাবলী এবং হাতের লেখা কোরআন শরীফ আজও বহু লোকের নিকট বর্তমানে রহিয়াছে। হযরত মাওলানা সাহেব সুলেখা বিষয়ে বিদ্যা বিশারদ হাফেজ আবদুল গণি মারহুমের নিকট হইতে শিক্ষা লাভ করেন যিনি সুলেখক হাফেজ মোহাম্মদ আলী সাহেবের একজন প্রসিদ্ধ ছাত্র ছিলেন।

হযরত মাওলানা ছাহেব (রহঃ) ধর্ম বিদ্যা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সময় সুযোগমত যুদ্ধবিদ্যাও শিক্ষা করিতেন। সেই যুগে তথায় "বেহারী" নামক একজন লোক যুদ্ধশাস্ত্রে সুদক্ষ ও পারদর্শী উস্তাদ ছিলেন। হিন্দু ও মুসলমানগণ তাঁহার নিকট সামরিক বিদ্যা শিক্ষা করিত। আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে এবং উস্তাদের আন্তরিক আশীর্বাদে তিনি কিছুদিনের চেষ্টার ফলেই যুদ্ধ বিদ্যায় অদ্বিতীয় ও কৃতিত্ব লাভে সমর্থ হন। হযরত মাওলানা সাহেব (রহঃ) অত্যন্ত শক্তিশালী ও সাহসী যোদ্ধা ছিলেন বলিয়াই স্বীয় মুর্শিদে বরহাক মহাত্মা মোজাদ্দেদ সাইয়্যেদ আহমদ বেরলভী (রহঃ)-এর সঙ্গে যুদ্ধে গমন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু মহাত্মা মোজাদ্দেদ (রহঃ) তাঁহাকে যুদ্ধে যাইতে অনুমতি না দিয়া হেদায়েত যুদ্ধে দেশ-বিদেশ ভ্রমণ করিয়া আল্লাহ্‌র তাওহীদ ও ধর্ম প্রচার করিতে হুকুম করিলেন।

হযরত মাওলানা শাহ্ কারামত আলী (রহঃ) সাহেব বহু দেশ-বিদেশ ভ্রমণ ও বহু পণ্ডিত লোকের নিকট ইলমে "মাকলাত" ও "মানকুলাত"

ইত্যাদি নানা বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা লাভের পর ১৮ বৎসর বয়সে "আমীরুল মু'মিনীন" "শায়খুল মিল্লাত ওয়াদ্দীন" মহাত্মা মোজাদ্দেদ হযরত সাইয়্যেদ আহমদ (রহঃ)-এর খেদমতে রায় বেরেলভীতে উপস্থিত হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। সেই সময় ভারতবর্ষ ও আরব দেশের সুপ্রসিদ্ধ ও বিজ্ঞ আলেমগণের একটি বিরাট দল হযরত মোজাদ্দেদ সাহেবের নিকট আধ্যাত্মিক বিদ্যা শিক্ষায় মাশগুল ছিলেন। হযরত মোজাদ্দেদ (রহঃ) সাহেব স্বীয় শিষ্য হযরত মাওলানা শাহ্ কারামত আলী সাহেবের মধ্যে সকল বিষয়ে পূর্ণ যোগ্যতা উপলব্ধি করিয়া একবারের সুদৃষ্টি দ্বারাই তাঁহাকে কামালাতের উচ্চ শিখরে পৌঁছাইয়া দেন। যাহাকে তরীকত পন্থীগণ "এত্তেহাদী তাওয়াজ্জুহ" নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। হযরত মাওলানা শাহ কারামত আলী (রহঃ) একাধারে আঠার দিন যাবত স্বীয় মুর্শিদে বরহাকের নিকট "তাছাউফ" বা ইলমে মারেফাত, তরীকাত, হাকীকতের গুপ্ত তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন। মহাত্মা মোজাদ্দেদ (রহঃ)-এর পরিপক্ক তাওয়াজ্জুহ ও কালবি তাছাররুফ দ্বারা হযরত মাওলানা (রহঃ) সাহেব অতি অল্প সময়ের মধ্যেই "মুশাহাদা" ও ছুলূকের মকামগুলি দক্ষতার সহিত উত্তীর্ণ হউন। তীক্ষ্ম ও মেধাবী শিষ্যের পক্ষে মুর্শিদে কামেলের আঠার দিনের ছোহ্বাত আঠার বৎসরের দীক্ষা লাভ হইতেও অধিক ফলপ্রদ।

হযরত মাওলানা (রহঃ) সাহেব তাঁহার রচিত "যা-দুত্তাকওয়ায়" উক্ত বিষয়ে লিখিয়াছেন যে, "হযরত মুর্শিদে বরহাক (রহঃ) রায় বেরেলভী মসজিদে আঠার দিন যাবৎ তরীকাতের সম্পূর্ণ গুরুতত্ত্ব এই খাকছারকে (মাওলানা রহঃ) বুঝাইয়া দিয়াছেন। উহার বরকতে এই ফকীর এমন তরীকা অবলম্বন করিয়াছেন যে, চারদিনের মধ্যেই নূরের পর্দাসমূহ অতিক্রম করা অত্যন্ত সহজ হইয়া পড়িল।" হযরত মাওলানা (রহঃ) সাহেব প্রত্যেক বিষয়ে অতীব তীক্ষ্ম ছিলেন, আল্লাহ্ তাআলা তাঁহার দ্বারা হেদায়েতে খালকুল্লাহ্‌র মনস্থ করিয়াই তাঁহাকে সকল প্রকারের গুণরাজিতে বিভূষিত করিয়াছিলেন। অতএব হযরত মোজাদ্দেদ সাইয়্যেদ আহমদ বেরলভী (রহঃ)-এর স্বল্প মুদ্দত সঙ্গবাসেই তরীকাতের সমুদয় গুপ্ত তত্ত্বজ্ঞান ও ছুলূকের মাকামগুলি অতি সহজে উত্তীর্ণ হওয়ার ক্ষমতা ও যোগ্যতা

তাঁহাকে খাছ ভাবেই আল্লাহ্ প্রদান করিয়াছিলেন। অতঃপর হযরত মোজাদ্দেদ সাইয়্যেদ আহমদ বেরলভী (রহঃ) তাঁহাকে বলিলেন, "কারামত আলী! তুমি মারেফাত ও তরীকাতে পূর্ণতা লাভ করিয়াছ। আল্লাহ্র ফজলে তোমার সাধনা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই পূর্ণ হইয়াছে। এখন অতিথি স্বরূপ আরো দুই চারদিন অবস্থান করতঃ হেদায়েতের যুদ্ধে অবতীর্ণ হও।" অতঃপর মুরীদ করিবার "সনদ", "খেলাফতনামা" ও "শাজরা" প্রদান করতঃ দেশ দেশান্তরে ভ্রমণ করিয়া লোকদিগকে ধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিবার জন্য অনুমতি ও আদেশ দিলেন এবং আল্লাহ্র দরবারে সুদীর্ঘ মুনাজাত দ্বারা তাঁহাকে বিদায় দিলেন। হযরত মাওলানা সাহেব স্বীয় মুর্শিদের আদেশানুযায়ী হেদায়েত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। বাংলা ও আসামে অন্ধ ও পথভ্রষ্ট সমাজকে শরীআত পালনে, নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, ফেতরা, কুরবানী, জুমুআ, জামাআত ও ধর্ম শিক্ষার প্রতি অনুপ্রাণিত করিলেন। স্থানে স্থানে অসংখ্য মাদ্রাসা ও অগণিত মসজিদ নির্মাণ করিয়াছিলেন। হযরত মাওলানা শাহ্ কারামত আলী (রহঃ) এতদ্দেশে ভ্রমণকালে যানবাহনের বড়ই অসুবিধা ছিল। বর্তমান যুগের ন্যায় ট্রেন ও স্টীমারের সুবন্দোবস্ত ছিল না। তিনি পদব্রজে, নৌকাযোগে, অনাহারে, অর্ধাহারে দিনের পর দিন শুধু কদু (লাউ) সিদ্ধ করিয়া খাইয়া এবং বেদআতী, খারেজী ও ভণ্ড ফকীরগণের অসহনীয় যাতনা-দুঃখ-বেদনা এবং লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও অবমাননা ধৈর্যসহকারে সহ্য করিয়া পূর্ণ ৫১ বৎসর কাল এই দেশ (বাংলা ও আসাম) হেদায়েত করিলেন। এতদ্দেশে হেদায়েতকালে তাঁহার সঙ্গে কয়েকখানি বোট ছিল। এমনকি একটি বোট শুধু শিক্ষাগার বা মাদ্রাসারূপে ব্যবহৃত হইত। তিনি স্বয়ং গ্রামের ছেলেদের ধরিয়া আনিয়া বিদ্যাশিক্ষা দিতেন। জনাব হযরত মাওলানা শাহ্ কারামত আলী (রহঃ) জৌনপুরের সুপ্রসিদ্ধ সরদার হাজী মুন্সী ইমাম বখ্শ সাহেবের সহযোগিতায় একটি আরবী মাদ্রাসা স্থাপন করেন যাহা আজ পর্যন্ত হানাফী মাদ্রাসা নামে বিখ্যাত ও বর্তমান। হযরত মাওলানা শাহ্ কারামত আলী (রহঃ) এই মাদ্রাসার নাম বিশেষ উপযুক্ত কারণে রাখিয়াছিলেন। এই মাদ্রাসায় বড় বড় আলেমগণ শিক্ষাদান করিয়াছেন

এবং এইখানে শিক্ষালাভ করিয়া বহু আলেম দূর দেশে গমন করিয়াছেন। এই মাদ্‌রাসার প্রথম শিক্ষক হিন্দুস্থানের সুবিখ্যাত আলেম লক্ষ্ণৌর ফিরিঙ্গি মহল্লার অধিবাসী হযরত মাওলানা আবদুল হালীম সাহেব (মাওলানা আবদুল হাই লক্ষ্ণৌবী সাহেবের পিতা)।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, যাঁহার অনুপ্রেরণায় ও আদেশে হযরত মাওলানা শাহ্ কারামত আলী (রহঃ) হেদায়েত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন, তিনি হইলেন তাঁহার (হযরত মাওলানার) মুর্শদে বরহাক হযরত মোজাদ্দেদ সাইয়্যেদ আহমদ বেরলভী (রহঃ)। পাঠকবর্গের সুবিধার্থে হযরত মোজাদ্দেদ সাইয়্যেদ আহমদ বেরলভী (রহঃ)-এর সম্পর্কে অতি সংক্ষেপে ইতিহাস হইতে সামান্য উদ্ধৃতি দিতেছি। "তারিখুল ইসলাম আব্বাসীর" ৫৫২ পৃষ্ঠায় তাঁহার সম্পর্কে নিম্নরূপ বর্ণিত হইয়াছেঃ "মাওলানা সাইয়্যেদ আহমদ সাহেবকে সারা উত্তর পশ্চিম হিন্দুস্থানের শিক্ষিত সমাজ ভালভাবেই জানেন। শতাব্দীতে বিশ্বনবীর সুন্নাত তাঁহারই সুদৃষ্টিতে হিন্দুস্থানে জীবিত হইয়াছে, নতুবা লোকে শুধু বিশ্বনবীর সম্মান করাকেই যথেষ্ট বলিয়া মনে করিত, তাঁহার তরীকা ও রীতিনীতির প্রতি কোন প্রকার ভ্রূক্ষেপই করিত না। তিনি "আলেম", "মুহাদ্দেস", "ওয়ায়েজ" (বক্তা), "মুজাহেদ" এবং "অলি আল্লাহ" ছিলেন। তিনি পেশাওয়ার ও হাজরা জিলার অসংখ্য মুসলমানদিগকে শিখদের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিয়াছেন। আফগানিস্তান ও আরব দেশে তাঁহার বহু অনুসরণকারী আজও বিদ্যমান। হিন্দু ও ইংরেজ এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বিগণ তাঁহার নিকট মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হয়। তিনিই পরাধীন জাতির আজাদীর এক অপূর্ব প্রেরণা দিয়াছিলেন। তাঁহার সর্বপ্রকার কার্যাবলী ছাহাবায়ে কেরামগণের ন্যায়ই ছিল। সাইয়্যেদ আহমদ ও তদীয় প্রিয় শিষ্য, প্রধানতম খলীফা মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাঈল সাহেবের দ্বারাই "ইলমে হাদীস" ভারতবর্ষে প্রচার ও প্রসার লাভ করিয়াছে। তিনি ধর্মদ্রোহী ও বিধর্মীদের সঙ্গে বহু যুদ্ধবিগ্রহ করিয়াছেন। শেষ পর্যন্ত বালাকোট ময়দানে শিখদের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াই ২৪শে জিলক্বদ ১২৪৬ হিজরীতে শহীদ হইয়াছেন"।

মহাত্মা মোজাদ্দেদ সাইয়্যেদ আহমদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির বহু উপযুক্ত খলিফা (প্রতিনিধি) ছিলেন। নিম্নে তাঁহার খলিফাগণের মধ্যে নিম্নলিখিত আল্লাহ্‌র খাছ বান্দা ও জনবরেণ্য ব্যক্তিবর্গের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১. হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইসমাঈল শহীদ দেহলভী (রহঃ)

২. হযরত মাওলানা আবদুল হাই মুহাদ্দেছে দেহলভী (রহঃ)

৩. কলিকাতার হযরত মাওলানা জামালুদ্দিন (রহঃ)

৪. হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আলী রামপুরী (রহঃ)

৫. নোয়াখালী জেলার কুত্‌বুল ইরশাদ হযরত মাওলানা শাহ্ ইমামুদ্দিন (রহঃ)।

৬. হযরত মাওলানা মিঞাজী নূর মুহাম্মাদ জানজবী (রহঃ) (ইনি হযরত হাজী ইমদাদুল্লা (রহঃ)-এর পীর)

৭. মক্কা শরীফের হানাফী মুছাল্লার ইমাম শায়খুল আয়িম্মা হযরত মোস্তফা মুরাদ (রহঃ)।

৮। কুত্‌বুল ইরশাদ, হাদীয়ে যামান, আলহাজ্ব শাহ্ ছুফী ক্বারী হযরত মাওলানা কারামত আলী (রহঃ) ধর্ম ও কর্মময় জীবন এবং পূর্ণ ৫১ বৎসর ব্যাপী বাংলা ও আসামের সর্বত্র ইসলামের খাঁটি বীজ বপন, রাফেজী খারেজী, লা-জুমুআ ও গায়রে মুকাল্লিদগণের সঙ্গে বাহাছ-মুবাহাছায় জয়লাভ, স্থানে স্থানে মক্তব-মাদ্‌রাসা স্থাপন ও মসজিদ নির্মাণ করিয়া শরীআতের প্রদীপ ও আধ্যাত্মিক মশাল প্রজ্বলিত করেন।

এক ইংরেজ লেখকের বর্ণনায় তাঁহার সম্বন্ধে নিম্নরূপ পাওয়া যায় ঃ

"সাইয়্যেদ আহমদ তাঁহার জেহাদ আন্দোলনের জন্য স্বেচ্ছাসেবী সংগ্রহ করিতে ও তরীকায়ে মুহাম্মদিয়া প্রচার করিতে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বেশ কিছু সংখ্যক খলিফা বা প্রতিনিধি পাঠান। পাঞ্জাবে রনজিৎ সিংহের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য লোক সংগ্রহ করাই এই খলিফাদের প্রধান কাজ ছিল। কারামত আলীকে বাংলায় পাঠান হইয়াছিল মুসলিম সমাজ হইতে সকল কুসংস্কার দূর করতঃ বাঙ্গালী মুসলমানদের জিহাদের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করিয়া মুজাহিদ

সংগ্রহ করিতে। কারামত আলী (রহঃ) উত্তর ভারতের জৌনপুর শহরে উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রায় অর্ধ শতাব্দীকাল বাংলা ও আসামে তরীকায়ে মুহাম্মদিয়া প্রচার করেন। ১৮৭৩ সালে প্রায় ৭৩ বছর বয়সে তিনি রংপুরে মারা যান।

অল্প বয়সেই তিনি সাইয়্যেদ আহমদের হাতে দীক্ষা গ্রহণ করেন। জেমস ওয়াইজ-এর মতে তিনি সাইয়্যেদ আহমদের সাথে মক্কায় হজ্জে যান এবং দেশে ফিরিয়া সাইয়্যেদ আহমদের অন্যতম সহকারীরূপে আত্মনিয়োগ করেন।[১]

অন্য এক বর্ণনায় হযরত মাওলানা শাহ্ কারামত আলী (রহঃ) সম্পর্কে নিম্নরূপ তথ্য পাওয়া যায় ঃ

"সাইয়্যেদ আহমদের শিষ্যত্ব গ্রহণের পূর্বে তিনি শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্র পুত্র ও সাইয়্যেদ আহমদের পীর শাহ্ আবদুল আজিজের নিকট জ্ঞান লাভ করেন। তাঁহার জীবন বহুমুখী সংগ্রামের মাঝে অতিবাহিত হয়। প্রথমতঃ তিনি ইসলামে প্রবিষ্ট হিন্দু আচার-আচরণ ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হউন ও পরে সনাতন ইসলামের মাঝে অন্যান্য ভিন্ন মতাবলম্বী মুসলমানদের সমবেত করিতে চেষ্টা করেন"।[২]

জনৈক লেখকের মতে "১৮৫৭ সালের পরবর্তীকালের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের সংগ্রামে বাঙালী মুসলমানদের এত অধিক সংখ্যায় অংশগ্রহণ করার অন্যতম কারণ মাওলানা কারামত আলীর প্রচেষ্টা।"[৩]

টীকা ঃ

অন্যত্র বর্ণিত হইয়াছেঃ "এই ব্যাপারে অবশ্য কোন দ্বিমত নাই যে মাওলানা কারামত আলী প্রত্যক্ষভাবে জিহাদে অংশগ্রহণ না করিলেও বালাকোট বিপর্যয়ের আগ পর্যন্ত তিনি এই সংগ্রামে সাহায্য করিয়াছেন।"[৪]

১ ঃ James wise, Notes on Races, Castes and Trades of Eastern Bengal (London 1833, পৃ. ২৭।

২ ঃ ইউসুফ আলী, Encyclopaedia of Islam Vol. II (Leyden 1927), পৃঃ ৭৫২।

৩ ঃ আকবর উদ্দীন, কায়েদে আযম (ঢাকা ১৯৬৯), পৃঃ ৫১।

৪. A. B. Mallick, British Policy and the Muslim in Bengal (Dhaka 1961), পৃঃ ১০১।

নির্ভরযোগ্য কিতাবাদিতে জনাব হযরত মাওলানা শাহ্ কারামত আলী জৌনপুরী (রহঃ)-এর বংশ পরিচয় নিম্নরূপ পাওয়া যায়। যাহাতে দেখা যায় হযরত মাওলানা ছাহেবের বংশ পরম্পরা পঁয়ত্রিশ পুরুষ উর্ধ্বে যাইয়া ইসলামের প্রথম খলিফা সাইয়্যেদুনা হযরত আবূ বকর ছিদ্দীক (রাঃ)-এর সহিত মিলিত হইয়াছে।

মাওলানা কারামত আলী ইবনে আবূ ইবরাহীম শেখ ইমাম বখশ ইবনে শেখ হারুল্লাহ ইবনে শেখ গুল মুহাম্মদ ইবনে শেখ মুহাম্মদ দায়েন ইবনে শেখ মুহাম্মদ ফাজেল ইবনে শেখ মুহাম্মদ অলি ইবনে শেখ আবু মুহাম্মদ ইবনে শেখ আবদুল্লাহ ইবনে শেখ আবুল ফাতাহ ইবনে শেখ হামিদ ইবনে শেখ মুহাম্মদ হাফেজ ইবনে শেখ মাখদুম শাহলাদ হাফেজ ইবনে শেখ সায়াদুল্লাহ হাফেজ ইবনে শেখ বোরহান উদ্দীন ইবনে শেখ আশরাফ ইবনে কাজী নেজামউদ্দীন ইবনে খাজা নাছিরুদ্দীন ইবনে খাজা নাজিব ইবনে খাজা সাইফুল্লাহ ইবনে খাজা শামসুদ্দীন ইবনে খাজা বায়জিদ ইবনে খাজা আবদুল্লাহ ইবনে খাজা সূফী ইবনে খাজা মোজাফফর ইবনে খাজা মোহআব ইবনে খাজা সাইফুদ্দীন ইবনে খাজা নাছিরুদ্দীন ইবনে খাজা আবূ সুবহান ইবনে খাজা আবু আলা ইবনে খাজা ওমর ইবনে খাজা আওহাদ ইবনে খাজা আবূ মুহাম্মাদ ইবনে খাজা ইবরাহীম ইবনে খাজা আহাম্মদ ইবনে খাজা মুহাম্মাদ ইবনে আমীরুল মু'মিনীন সাইয়্যেদুনা আবূ বকর ছিদ্দীক (রাঃ)।

হযরত মাওলানা (রহঃ)-এর বাংলাদেশের প্রথম ভ্রমণ ক্রমান্বয়ে আঠার বৎসর পর্যন্ত চলিয়াছিল। প্রথম ভ্রমণেই মাওলানা সাহেব পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার প্রতিটি জেলায় তাবলীগ করিতে করিতে আসাম প্রদেশ পর্যন্ত উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি যেখানেই উপস্থিত হইতেন তথায় তাবলীগ ও প্রচারের ব্যবস্থা সুদৃঢ় করিয়া এবং মৃত সমাজদেহে ইসলামী তেজ প্রবেশ করাইয়া দিতেন। স্থানে স্থানে ধর্ম প্রচারকারী নিযুক্ত করেন এবং মসজিদ ও মাদ্রাসা স্থাপন করেন। লোকের মধ্যে শরীআতের আদেশাবলীর অনুগত হওয়ার প্রেরণা জাগরিত করেন এবং আসল মুসলমানে পরিণত করেন। ভ্রমণকালে মাঝে মাঝে দুই চার বৎসর পরে আত্মীয় স্বজনের নিকট হইতে বাড়ীতে ফিরিবার জন্য তাগাদা আসিতেছিল। এমনকি তাঁহার সঙ্গী ও সেবকগণ পর্যন্ত অনুরোধ করিতেন যে জৌনপুরে ক্ষুদ্র ঘর বাড়ী দেখিয়া পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া যেন তাবলীগের কাজ সম্পন্ন করেন। উত্তরে হযরত

মাওলানা ছাহেব বলিতেন যে, আমার ১৮ দিবস মুর্শিদে কামেলের দরবারে উপস্থিত থাকার পর, বিদায়কালে তিনি যে সকল শান্তিদায়ক কথাবার্তা হেদায়েতের নিয়ম ও উহা প্রচার করার বিষয় যে সকল সুসংবাদ প্রদান করিয়াছিলেন ঐ সমুদয় সর্বদাই প্রকাশিত হইয়া চলিয়াছে এবং উহার প্রতিফল কারী কামেলের বর্ণনানুযায়ী প্রকাশিত হইয়া চলিয়াছে। এখনও অনেক কিছু বাকী রহিয়াছে, যাহার প্রকাশ অবশ্য কর্তব্য বলিয়া মনে হয়। কাজেই এই অবস্থায় ভ্রমণ কার্য ত্যাগ করিয়া হেদায়েত ও তাবলীগের কাজ বন্ধ করা-এই ফকীরের ধারণার বাহিরে। ইহা এমনই কার্য যে বাংলাদেশের স্থানে স্থানে এই ফকীর অপেক্ষা বড় বড় সম্মানিত ব্যক্তিগণ বর্তমান থাকা সত্ত্বেও পীর বরহাক এই হতভাগাকে হিন্দুস্থান ভ্রমণ করার এবং বাংলাদেশে তাবলীগের কাজ সমাধা করার মহান কাজের ভার প্রদান করিয়াছেন। এমনকি এই ভ্রমণে আমার সহিত স্ত্রী-পুত্রগণকে রাখার হুকুম প্রদান করিয়াছেন। ইহাতে নিশ্চয়ই কোন রহস্য নিহিত রহিয়াছে। এই আদেশ ও অনুমতির মধ্যে নিশ্চয়ই বিশেষ ভাব ও রহস্য আছে। এই সকল শান্তিদায়ক কথাবার্তায় মাওলানা সাহেবের প্রিয় অনুচরবৃন্দ শান্তি লাভ করিত।

হেদায়েত কার্যে পর্যায়ক্রমে আসাম প্রদেশে উপস্থিত হইলেন। হযরত মাওলানা (রহঃ)-এর বোট যখন আসামে উপস্থিত হইল, তখন তথাকার অবস্থা এতই বিশ্রী ও খারাপ ছিল যে, সেখানকার লোকদের বাহ্যিক চাল-চলন ও ছবিসূরত দেখিয়া মুসলমান বলিয়া বুঝিবার কোন উপায় ছিল না। শরীআতানুযায়ী পোশাক-পরিচ্ছদ থাকাত দূরের কথা, এমনকি লজ্জাস্থান ঢাকাও আবশ্যক মনে করিত না। হযরত মাওলানা ছাহেব তথায় কিছুকাল অবস্থান করেন এবং কতিপয় উপযুক্ত লোকের দ্বারা লোকদিগকে ডাকিয়া প্রত্যেককে সতর-লজ্জাস্থান ঢাকার একটি করিয়া কাপড় এবং একটি টুপি মাথা ঢাকার জন্য প্রদান করেন। অতঃপর মাওলানা ছাহেব ঢাকা হইতে লোক মারফত চার হাজার লুঙ্গী ও কিছু পরিমাণ থান কাপড় আনাইয়া লোকদিগের মধ্যে বণ্টন করে দেন। ইহাতে পোশাকের সঙ্গে সঙ্গে ঐ সকল লোকদের মধ্যে পরস্পর ভালবাসার সৃষ্টি হইল। জনৈক ইংরেজ লিখিয়াছেন যে, জৌনপুরের মাওলানা কারামত আলী সাহেব বাংলা ও আসামের লোকদেরকে শুধু মুসলমানে পরিণত করিয়া ক্ষান্ত হন নাই,

উপরন্তু তিনি কাপড় ও পোশাক প্রদানে অমুসলমানদেরকে মুসলমানে পরিণত করেন।

আজ আমাদের চক্ষের সামনে বাংলাদেশে মুসলমানের সংখ্যা ও ধর্মের উন্নতি তাহার ভিত্তিমূলে রহিয়াছে মাওলানা সাহেবের বিরাট ব্যক্তিত্ব, অদম্য প্রেরণা ও অক্লান্ত প্রচেষ্টা। বলিতে গেলে বাংলার মুসলমান তাঁহারই প্রচেষ্টায় গড়িয়া উঠিয়াছে এবং লক্ষ লক্ষ মুসলমান হেদায়েত পূর্বক ধর্মের সুশীতল ছায়ার নীচে আশ্রয় গ্রহণ করে আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্য লাভ করিয়াছে।

হযরত মাওলানা (রহঃ) সাহেব আঠার বৎসর পর্যন্ত হেদায়েতের ভ্রমণ কার্য আসাম পর্যন্ত পৌঁছিয়া সমাপ্ত করেন। অতঃপর আত্মীয়-স্বজন সহকারে নিজ আবাসভূমি জৌনপুরে উপস্থিত হউন এবং স্বীয় মাননীয় পিতার সহিত সাক্ষাত করে সালাম, মুসাফাহ্ ও কোলাকুলী করার পর সৌভাগ্যশালী হউন।

হযরত মাওলানা সাহেবের মাননীয় পিতা মৌলভী আবূ ইবরাহীম শেখ ইমাম বখ্শ সাহেব এই সময় সম্পূর্ণ সুস্থ ও নিজ করণীয় কাজে লিপ্ত ছিলেন। তিনি উপস্থিত লোকগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন যে, কোন কোন লোকের নিকট ইহা খুবই আশ্চর্যবোধ হইয়াছিল যে, জনাব সাইয়্যেদ সাহেব (রহঃ) মাওলানা কারামত আলী সাহেবকে প্রথম সপ্তাহেই বলিয়া দিয়াছিলেন যে, কার্য সিদ্ধি হইয়া গিয়াছে, এখন হেদায়েতের কাজে লাগিয়া যাও। অতঃপর আঠার দিবস পরে অনুমতি ও খেলাফত প্রদান করতঃ বিদায় দান করেন এবং জেহাদে যাওয়ার সময় তাহার উপর বাংলাদেশের তাবলীগের ভার অর্পণ করিয়া যান। মাওলানা সাহেবও তাঁহার (সাইয়্যেদ সাহেবের) আদেশানুসারে কাজে লেগে যান। এখন বলুন তাঁহার (কারামত আলী সাহেবের) ভ্রমণকাল কতদিন হইয়াছে এবং কতকাল পর ফিরিয়া আসিয়া সমবেত লোকগণের সহিত মিলিত হইয়াছেন।

উপস্থিত লোকগণ বলিলেন যে, মাওলানা সাহেব পূর্ণ আঠার বৎসর পরে আল্লাহ্‌র রহমতে পরিবার ও সন্তানাদির এক জামাআত সহকারে বাড়ী ফিরিয়াছেন। তখন মাওলানা সাহেবের মাননীয় পিতা বলিলেন, এখন দেখুন সাইয়্যেদ সাহেবের ফয়েজ ও বরকতের ফলস্বরূপ এক একদিন পূর্ণ বৎসরের তাবলীগের ক্ষমতা রাখে। ইহা প্রত্যক্ষ যে প্রিয় বন্ধুবান্ধবগণ

আমাকে বলিয়াছেন আপনি মাওলানা সাহেবকে লিখুন যে, বহুদিন অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে, মাওলানা সাহেব হযরত কারামত আলী (রহঃ) জৌনপুরের কথা ভুলিয়া গিয়াছেন এবং আশে-পাশের মুরীদগণ আশা ও নিরাশার মাঝে অবস্থান করিতেছে। কিন্তু আমি তাহাকে কখনও তাবলীগের কাজে বাধাগ্রস্ত হইয়া দেশে আসিতে লিখি নাই। "আঠার বৎসর পরে যখন মাওলানা সাহেব জৌনপুর আগমন করেন তখন চারদিক হইতে ভক্তগণ ও মুরীদগণের সমাবেশ হইতে লাগিল। তিনি শহরের চারদিক এবং আজম গড়, গাজীপুর, ফয়জাবাদ, সুলতানপুর ইত্যাদি জেলাসমূহে ভ্রমণের ইচ্ছা করিলেন এবং এই সমস্ত জেলায় তাবলীগের কাজ পূর্ণভাবে আদায় করেন। ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে মাওলানা সাহেব বাংলা ও আসামে তাবলীগের কাজ ৫১ বৎসর পর্যন্ত চালাইয়াছিলেন। বাংলাদেশে যাওয়ার পূর্বে হযরত মাওলানা সাহেব ভারতের ইউ, পি'র কতক জেলায় তাবলীগের কার্য করিয়াছিলেন। ওয়াজ-নসীহত করার সঙ্গে সঙ্গে কিতাব প্রণয়ন ও সংকলনের কাজও করিয়াছিলেন।

জৌনপুরের প্রাচীন লোকদের নিকট হইতে জানা গিয়াছে যে, একবার মাওলানা সাহেব পূর্ববাংলা হইতে বোট যোগে আত্মীয়-স্বজন সহকারে জৌনপুর উপস্থিত হউন।

সামুদ্রিক দীর্ঘ ও কঠিন রাস্তা অতিক্রমকালে বিহার প্রদেশে উপস্থিত হউন এবং সেই প্রদেশের জেলাসমূহের লোকজনকে সুমধুর ওয়াজ দ্বারা বাধিত করিয়াছিলেন।

সাইয়্যেদ আহমদ বেরলভী (রহঃ) ও শাহ্ ইসমাঈল শহীদ (রহঃ)[১] উভয়ই আত্মিক ও চিন্তাগত দিক থেকে একই অস্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। আর এই একক অস্তিত্বকে আমি স্বতন্ত্র মুজাহিদ মনে করি না বরং শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্‌র তাজদীদের পরিশিষ্ট মনে করি। তাঁহাদের কর্মকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত সার হইল ঃ

টীকাঃ ১. সাইয়েদ আহমদ ১২০১ হিজরীতে (১৭৮৬ খ্রীঃ) জন্মগ্রহণ করেন ও ১২৪৬ হিজরীতে (১৮৩১ খ্রীঃ) শাহাদৎ বরণ করেন। শাহ ইসমাঈল শহীদ ১১৯৩ হিজরীতে (১৭৭৯ খ্রীঃ) জন্মগ্রহণ করেন ও ১২৪৬ হিজরীতে (১৮৩১ খ্রী ঃ) শাহাদৎ বরণ করেন। সম্ভবতঃ ১৮১০ হিজরীতে কাছাকাছি সময়ে সাইয়েদ আহমদের মধ্যে বিপ্লবী আন্দোলনের শিখা প্রজ্বলিত হয়।

তাঁহারা সাধারণ মানুষের ধর্ম, চরিত্র, আচার-ব্যবহার ও লেন-দেনের সংস্কারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। যেই সব স্থানে তাঁহাদের প্রভাব পৌছায় সেখানে জীবনধারায় এমন বিপুল বিপ্লব সাধিত হয় যে, মানুষের চোখে সাহাবাদের জামানার চিত্র ভাসিয়া উঠে।

উনবিংশ শতকের প্রথম দিকে ভারতের ন্যায় একটি পতনোন্মুখ দেশে তাঁহারা যেভাবে ব্যাপকহারে জিহাদের প্রস্তুতি নেন এবং এ প্রস্তুতির ক্ষেত্রে যেভাবে নিজেদের সাংগঠনিক যোগ্যতার পূর্ণতা প্রকাশ করেন, তাহা এক প্রকার অসম্ভবই ছিল। অতঃপর একান্ত দূরদর্শীতার সাথে তাঁহারা কার্যারম্ভের জন্য উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষকে নির্বাচিত করেন। বলা বাহুল্য ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক দিক দিয়ে এটিই ছিল এই কাজের উপযোগী স্থান। অতঃপর এই জিহাদে তাঁহারা এমন চরিত্রনীতি ও যুদ্ধনীতি ব্যবহার করেন যে, তাহার মাধ্যমে একজন দুনিয়াদার স্বার্থবাদী যোদ্ধার মোকাবিলায় একজন আল্লাহ্র পথে জিহাদকারী বিশিষ্টতা অর্জন করতে সক্ষম হয়। এই ভাবে তাঁহারা দুনিয়ার সম্মুখে আর একবার সঠিক ইসলামী আদর্শ ও ধ্যান ধারণার বিকাশ ঘটান। তাঁহাদের যুদ্ধ দেশ, জাতি বা দুনিয়ার স্বার্থকেন্দ্রিক ছিল না বরং একান্তভাবে আল্লাহ্র পথে ছিল। আল্লাহ্র সৃষ্টিকে জাহেলিয়াতের শাসন মুক্ত করে তাহাদের উপর স্রষ্টা ও বিশ্বজাহানের মালিকের শাসন প্রতিষ্ঠিত করা ছাড়া তাঁহাদের দ্বিতীয় কোন উদ্দেশ্য ছিল না। এই উদ্দেশ্যে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে নিয়মানুযায়ী প্রথমে তাঁহারা ইসলাম অথবা জিজিয়ার দিকে আহ্বান করেন। অতঃপর নিজেদের পক্ষ থেকে পূর্ণ রূপে নিশ্চিন্ত হইবার পর তাঁহারা অস্ত্র ধারণ করিতেন। আর অস্ত্র ধারণ করিবার পর ইসলামের মার্জিত ও উন্নত যুদ্ধ আইনের পুরাপুরি আনুগত্য করিতেন। কোন নির্যাতনমূলক ও হিংস্র কার্য তাঁহাদের দ্বারা সম্পাদিত হয় নাই। তাঁহারা যে লোকালয়ে প্রবেশ করেন, সংস্কারক হিসেবেই প্রবেশ করেন। তাঁহাদের সেনাদলের সঙ্গে শরাব থাকিত না, ব্যাণ্ড বাজিত না, পতিতাদের পল্টুন তাঁহাদের সঙ্গে থাকিত না, তাঁহাদের সেনানিবাস ব্যভিচারীদের আড্ডাখানায় পতিত হইত না এবং এমন কোন

দৃষ্টান্তও পাওয়া যায় নাই যে, তাঁদের সেনাদল যে স্থান অতিক্রম করিয়াছে সেখানকার মহিলারা তাঁহাদের সতীত্ব হারিয়ে মাতম করিয়াছে। তাঁহাদের সিপাহীরা দিনে ঘোড়ার পিঠে ও রাতে জায়নামাযের উপর থাকিতেন। তাঁহারা আল্লাহ্‌র ভয়ে ভীত থাকিতেন, আখেরাতের হিসাব ও জবাবদিহিকে হামেশা সম্মুখে স্মরণ করিতেন- এই ব্যাপারে তাঁহারা কোন প্রকার লাভ ক্ষতির পরোয়া করিতেন্‌ না। কোথায়ও পরাজিত হইলে কাপুরুষ প্রমাণিত হন নাই। আবার কোথায়ও বিজয় লাভ করিয়া তাঁহারা নিষ্ঠুর ও অহংকারী প্রমাণিত হন নাই। ভারতবর্ষে তাঁহাদের আগে ও পরে এ ধরনের নির্ভেজাল ইসলামী জিহাদ আর অনুষ্ঠিত হয় নাই।"

আগেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, সাইয়্যেদ আহমদ বেরলভী (রহঃ) খেলাফতনামা প্রাপ্ত হইয়া এবং তাঁহার নির্দেশে মাওলানা কারামত আলী সাহেব বাংলাদেশে হেদায়েত যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে হেদায়েত কার্য পরিচালনাকালীন তিনি (মাওলানা সাহেব) ধর্ম যুদ্ধের জন্য মুজাহিদও সংগ্রহ করেন।

হযরত মাওলানা কারামত আলী সাহেবের জীবন ছিল একটি আদর্শ জীবন। যাঁহারা দুনিয়াতে আসেন মানুষের কল্যাণের জন্য, মাজলূমের সাহায্যের জন্য, তাঁহারা দুনিয়াতে রাখিয়া যান অনাবিল আদর্শ, যাহা দ্বারা মানুষ যুগে যুগে উৎকৃষ্ট জীবন লাভ করিতে পারে। অসংখ্য কার্য সমাপন ও অধ্যাপনা, উপদেশ শেষ করার পর তিনি যে সময়টুকু পাইতেন তাহা বৃথা আয়াসে কাটাইতেন না। তিনি সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন যে মৌখিক উপদেশ অপেক্ষা লিখিত উপদেশ ফলপ্রসূ। তাই তিনি বিভিন্ন বিষয়ে বহু গ্রন্থাবলী রচনা করিয়াছেন, যাহাতে তাঁহার উপদেশাবলী, বক্তৃতা, রচনাবলী এবং মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় তথ্য লিপিবদ্ধ হইয়াছে। নিম্নে তাঁহার প্রণীত ও সংকলিত কিতাবসমূহের তালিকা যোগ করা হইল। মাওলানা সাহেব প্রণীত কিতাবসমূহের অধিকাংশই শিরক ও বেদআত খণ্ডন, ধর্ম বিশ্বাস ঠিক করা এবং কুরীতি দূর করার বিষয়ে লিখিত। কিতাবগুলির তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ

নং	কিতাবের নাম	কোন্ ভাষায় লিখিত	সংক্ষিপ্ত বিবরণ
১.	মেফতাহুল জান্নাত	উর্দূ	ইহা ফেকার কিতাব ও বিশেষ আদরণীয়।
২.	জিনাতুল মুসল্লী	উর্দূ	নামাজিদের জন্য ফেকার মাসয়ালা বিষয়ক
৩.	মোখরিজুল হরূফ	উর্দূ	কেরাত বিষয়ক, ইহা মাদ্রাসার তালিকাভুক্ত।
৪.	জিনাতুল কারী	উর্দূ	ঐ
৫.	শরহে হিন্দি জজরি	উর্দূ	কেরাত বিষয়ক খুব বিস্তৃত কিতাব।
৬.	কাওকাবে দুর্‌রি	উর্দূ	লোগাতে কোরআন বিষয়ক উত্তম কিতাব।
৭.	তরজুমায়ে শামায়িলি তিরমিযি	উর্দূ	শামায়েলে তিরমিযির উর্দূ অনুবাদ।
৮.	তরজুমায়ে মিশকাত	উর্দূ	প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থ, মিশকাতের উর্দূ তরজমা।
৯.	আকায়েদে হাক্কা	উর্দূ	প্রশ্নোত্তরে আকায়েদের কিতাব।
১০.	তাজকিরাতুল আকায়েদ	উর্দূ	মিথ্যা আকায়েদ খণ্ডন বিশেষতঃ খারেজিদের আকিদা খণ্ডন বিষয়ক।
১১.	কাওলুছছাবিত	উর্দূ	শেরক, বেদআত এবং শরীআতের বিরুদ্ধে রীতি-নীতি খণ্ডন বিষয়ক।
১২.	মাকামিউল মোবতাদিইন	উর্দূ	কোন এক বেদআতী আলেমের সহিত ৬টি প্রশ্নোত্তর।
১৩.	হক্কুল ইয়াকীন	উর্দূ	ওয়াজ-নসিহত এবং আদেশ-নিষেধ বিষয়ক।
১৪.	বয়আত ও তাওবা	উর্দূ	তরীকার পীরগণের হাতে বয়আত ও তাওবা করার বিষয়ক বিরুদ্ধবাদীদের প্রতি প্রামাণ্য উত্তর এবং বিশেষ জরুরী কিতাব।
১৫.	কাওলুল আমীন	উর্দূ	লা-জুমাদের কুমন্ত্রণা দানের প্রতিবাদ।
১৬.	মুরাদুল মুরীদীন	উর্দূ	বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা, ইহাতে খারেজীদের খণ্ডন, কেয়াম ও মিলাদের দলিল, মুনাফেকিনদের বিবাদ, পীরে কামেলদের বর্ণনা বিষয়ক পুস্তক।
১৭.	কাওলুল হক	উর্দূ	মিলাদের বিষয় তিনটি অবস্থার বর্ণনা।
১৮.	মেরাতুল হক	উর্দূ	ধর্মের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টিকারীদের খণ্ডন।
১৯.	ইতমিনানুল কুলূব	উর্দূ	বেদআত এবং ফাছাদ সৃষ্টিকারীদের প্রতিবাদের উত্তর।
২০.	মোকাশিফাতে রহমত	উর্দূ	১০টি উপদেশ, ৫জন মুনাফেকের কথা এবং হযরত সাইয়্যেদ সাহেবের মোজাদ্দেদ হওয়ার প্রমাণ। এতে বহু প্রয়োজনীয় মাসআলা উল্লেখ করা হইয়াছে।

নং কিতাবের নাম	কোন্ ভাষায় লিখিত	সংক্ষিপ্ত বিবরণ
২১. মোলাখ্খাছ	আরবী	মিলাদের বিষয় প্রমাণ্য দলিল এবং মক্কা ও মদীনা শরীফের ৪ জন ইমামের ফতোয়া।
২২. ফয়জে আম	উর্দূ	নক্শবন্দিয়া তরীকার কাজ, লতিফাসমূহের বর্ণনা ও ইলমে মারেফাতের বর্ণনা।
২৩. হুজ্জাতে কাতেয়া	উর্দূ	বাংলাদেশের খারেজী সম্প্রদায়ের কথা, লা-জুমাদের প্রতিবাদ এবং জুমা জায়েয হওয়ার বিষয় মক্কা শরীফের ফতোয়া।
২৪. নুরুল হুদা	উর্দূ	ইলমে মারেফাত এবং তিন প্রকার তাজাল্লির বিস্তৃত বর্ণনা।
২৫. যা-দুত্তাকওয়া	উর্দূ	ইলমে মারেফাত এবং চার তরীকার কার্যাবলীর বিষয়ে গ্রহণযোগ্য কিতাব।
২৬. কিতাবে এস্তেকামাত	উর্দূ	সুন্নাতের অনুসরণ এবং ধর্মের প্রতি দৃঢ় থাকার বিষয় একটি ভূমিকা। উহাতে ২১টি বিষয় এবং একটি পরিসমাপ্তির উল্লেখ আছে।
২৭. নূরুন আলা নূর	উর্দূ	ইলমে মা'রেফাত বিষয়ক কতিপয় বিশেষ মাসআলা।
২৮. রাহাতে রূহ	উর্দূ	ইলমে মারেফাত বিষয়ক।
২৯. কুউওয়াতুল ঈমান	উর্দূ	ঐ
৩০. ইহকাকুল হক	উর্দূ	ছয় লতিফার জেকেরর কথা এবং মুরাকাবার শিক্ষা।
৩১. রাফিকুচ্ছালিকীন	উর্দূ	ঐ
৩২. তানবীরুল কুলূব	উর্দূ	ইলমে মারেফাত বিষয়ক।
৩৩. তাজকিয়াতুন্নেছওয়ান	উর্দূ	মেয়েলোকের পর্দা বিষয়ক মূল্যবান কিতাব।
৩৪. নাছিমুল হারামাইন	আরবী	বেদআত খণ্ডন।
৩৫. বারাহিনে কাতেয়া	আরবী	
৩৬. মৌলুদে খায়রুল বারিয়া	আরবী/উর্দূ	মিলাদ শরীফের প্রামাণ্য কিতাব।
৩৭. কেরামাতুল হারামাইন	উর্দূ	মিলাদ ও কেয়ামের দলিল (ছাপা হয় নাই)।
৩৮. কোররাতুল উইউয়ুন	উর্দূ	মক্কা ও মদীনা শরীফের গুণাবলী।
৩৯. রেসালায়ে ফায়সেলা	উর্দূ	
৪০. ওক্কাজাতুল মোমেনীন	উর্দূ	
৪১. ফতহে বাবে ছবিয়ান	ফার্সী	ছোটদের ফার্সী গ্রামার
৪২. দাওয়াতে মাছনুনা	আরবী/উর্দূ	হাদীস শরীফ হইতে সংগৃহীত দুআসমূহ।

প্রকাশ থাকে যে, পাঠকগণের সুবিধার জন্য পুস্তক প্রকাশকগণ মাওলানা জৌনপুরীর বিভিন্ন কিতাবসমূহ একত্র করিয়া গ্রন্থাকারে ছাপাইয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এই পর্যন্ত যখীরায়ে কেরামতের তিনটি খণ্ড প্রকাশ হইয়াছে। প্রত্যেক খণ্ডের বিস্তৃত বর্ণনা ঃ

১ম খণ্ড ঃ- যখীরায়ে কেরামত নিম্নলিখিত আটখানা কিতাব নিয়া সমাপ্ত— ১. মোকাশেফাতে রহমত, ২. ফয়জে আম, ৩. তাজকিয়াতুল আকায়েদ ৪. হুজ্জাতে কাতেয়া, ৫. নূরুল হুদা, ৬. কিতাবে এস্তেকামাত, ৭. যীনাতুল মোছল্লী এবং ৮. আকায়েদে হাক্কা।

২য় খণ্ডঃ যখীরায়ে কেরামত ২য় খণ্ড নিম্নলিখিত ৬ খানা কিতাব লইয়া সমাপ্ত—১. কাওলুচ্ছাবিত ২. দাওয়াতে মাছনূনা, ৩. মাকামেউল মোবতাদীন ৪. হক্কুল ইয়াকীন, ৫. বয়আতে তাওবা, ৬. কাওলুল আমীন।

৩য় খণ্ড ঃ যখীরায়ে কেরামত ৩য় খণ্ড নিম্নলিখিত ৫ খানা কিতাব নিয়া সমাপ্ত- ১. মুরাদুল মুরীদীন, ২. মোলাখখাছ ৩. কাওলুল হক ৪. মেরাতুল হক ৫. ইতমিনানুল কুলূব। উক্ত তিন খণ্ড মোট ১৯ খানা কিতাবে সমাপ্ত।

শরীআত ও তরীকতের উজ্জ্বল রবি, বাংলা আসামের প্রধান হাদী, হযরত মাওলানা শাহ্ কারামত আলী জৌনপুরী (রহঃ) পূর্ণ ৫৭ বৎসর, তন্মধ্যে ৫১ বৎসর বাংলা ও আসামে হেদায়েত কার্য সুসম্পন্ন করিয়া ১২৯০ হিজরী রবিউস্সানী মাসের ২ তারিখ শুক্রবার প্রাতঃকালে কালিমায়ে শাহাদাত পড়িতে পড়িতে ৭৫ বৎসর বয়সে বাংলাদেশের রংপুর জেলার মুন্সীপাড়ায় ইন্তিকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহি.....রাজিউন।) তাঁহার মাজার শরীফ বাংলাদেশের রংপুর জেলা শহরের মুন্সীপাড়া জামে মসজিদের মধ্যে অবস্থিত। যাহা সর্বসাধারণের দর্শনীয় স্থানে পরিণত হইয়াছে। দূর দূরান্ত হইতে প্রত্যহ বহুলোক যিয়ারত করিতে আসে এবং তাঁহার রুহানী ফয়েজ লাভ করিয়া উপকৃত হয়।

মৃত্যুকালে তাঁহার পরিবারবর্গের অধিকাংশ আত্মীয়-স্বজন তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। তাঁহার তিরোধানকালে নিম্নোক্ত পুত্রগণ জীবিত ছিলেন।

১. কুত্বুল আকতাব হযরত মাওলানা শাহ্ হাফেজ আহমদ সাহেব (রহঃ)।

২. হযরত মাওলানা শাহ্ হাফেজ মাহমূদ সাহেব (রহঃ)

৩. হযরত মাওলানা শাহ সূফী মোহাম্মদ হামেদ সাহেব (রহঃ)

৪. হযরত মাওলানা শাহ্ সূফী মোহাম্মদ ওমর সাহেব (রহঃ)

৫. বাহ্রুল উলূম হযরত মাওলানা শাহ্ হাফেজ আবদুল আউয়াল সাহেব (রহঃ)

উক্ত সন্তানগণের মধ্যে তাঁহার বড় পুত্র কুতবুল আকতাব হযরত মাওলানা শাহ্ হাফেজ আহমদ সাহেবকে[১] গদ্দীনশীন করিয়া হেদায়েত ও

টীকাঃ ১. হযরত মাওলানা শাহ্ হাফেজ আহমদ (রহঃ) ১২৫০ হিজরীতে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। (তখন তাঁহার পিতা হযরত মাওলানা শাহ্ কারামত আলী (রহঃ) কলিকাতায় অবস্থান করিতেছিলেন।) হযরত মাওলানা শাহ্ হাফেজ আহমদ (রহঃ) চার বৎসর বয়সে তাঁহার পিতা হযরত মাওলানা শাহ্ কারামত আলী সাহেব (রহঃ) তাঁহাকে কোরআন মাজীদের প্রথম ছবক দেন। আল্লাহ্ প্রদত্ত তীব্র মেধা শক্তি বলে তিনি কোরআন মাজীদ অনর্গল মুখস্থ পড়িতে আরম্ভ করিলেন। ইহা দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হউন। অল্পকালের মধ্যেই তিনি নাহ্-ছরফ, মানতেক, হিকমাত, বালাগাত, হাদীস, তাফসীর ইত্যাদি ইলমে মাকুলাত ও মানকুলাত বিষয়ে অদ্বিতীয় ক্ষমতা অর্জন করিলেন। এইভাবে তাঁহার জ্ঞান গরিমা ও অলৌকিক কার্যাবলীর পরিচয় সারা দেশে ছড়াইয়া পড়িল। হযরত মাওলানা হাফেজ আহমদ সাহেব (রহঃ) জৌনপুর শহরের শাহী মসজিদে কোরআন শরীফ, ধর্মীয় শিক্ষা ও বিভিন্ন বিষয়ের তালীম দিতেন।

কোন প্রকার গোলমালের সৃষ্টি না করিয়া নিরবে ইসলাম ধর্ম প্রচার ও শিরক বেদআতের মূলোৎপাটন করাই তাঁহার জীবনের প্রধান ব্রত ছিল। এই ব্রত তিনি পরিপূর্ণরূপেই পালন করিয়া গিয়াছেন। বিভিন্ন গ্রন্থাবলীতে তাঁহার পবিত্র জীবনের অসাধারণ অলৌকিক ঘটনাবলী বিস্তারিত বর্ণিত হইয়াছে। কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় এইখানে লিপিবদ্ধ করা হইল না। হযরত মাওলানা শাহ্ হাফেজ আহমদ (রহঃ) (এর হাতে বহু অ-মুসলমান বাইয়াত গ্রহণ করিয়া ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন। তাঁহার লক্ষ লক্ষ মুরীদান ছিল। হিন্দুস্থানের সুপ্রসিদ্ধ আলেম বিখ্যাত গ্রন্থ "মজমুয়ায়ে ফাতাওয়া" প্রণেতা হযরত মাওলানা আবদুল হাই সাহেব (রহঃ) ফেরেঙ্গী মহল্লী তাঁহার মুরীদ ছিলেন।

হযরত মাওলানা আবদুল বাতেন সাহেব "সীরাতে মাওলানা কারামত আলী" নামক কিতাবে লিখিয়াছেন যে, হযরত মাওলানা শাহ্ হাফেজ আহমদ সাহেব শেষ বারের মত

যাবতীয় কার্যের ভার তাঁহার হাতে অর্পণ করতঃ শেষ মোনাজাতে আল্লাহ্র দরবারে শেষ প্রার্থনা করিলেন ঃ "হে আল্লাহ্! ধর্মের প্রদীপ সর্বদা উজ্জ্বল রাখ, আমার সকল মুরীদান ও ভক্তগণের তথা সকল মুমেন ও মুমেনাতগণের ইহকাল ও পরকাল মঙ্গল কর, আমার বংশাবলী ও খলিফাগণ দ্বারা কিয়ামত পর্যন্ত হেদায়েত কার্যে আঞ্জাম দাও এবং তাহাদের দ্বারা ইসলামের গৌরব বৃদ্ধি কর। আমীন।"

* ফাজলে কর ইয়া রব্ মোহাম্মদ মুস্তাফা কী ওয়াস্তে,
সাইয়্যিদুল কাওনাইনে শাহে আম্বিয়া কী ওয়াস্তে।
* আউর সব আসহাব ওয়া আলে মোজতাবা কী ওয়াস্তে,
রহম কর মুজ্হ পর ইলাহী আউলিয়া কী ওয়াস্তে।

খাদেম, বুলবুল (প্রকাশক)
তাং ১৯-১২-০৫ইং
রোজঃ সোমবার

স্বদেশ জৌনপুর যাওয়ার পথে ১২৯৯ হিজরীতে শহরে গেলে তথাকার মুসলমান এমনকি হিন্দু ও খ্রীষ্টানগণ হযরতের দরবার শরীফে দিবারাত্র জড় হইয়া থাকিত। কলিকাতার দৈনিক ও সাপ্তাহিক সংবাদপত্রসমূহে হযরতের কামালাত ও কারামতের বিষয় বিভিন্ন শিরোনামে প্রকাশিত হইত। তিনি কয়েকমাস জৌনপুরে অবস্থান করতঃ হজ্জ করার উদ্দেশ্যে পবিত্র হেজাজ ভূমির দিকে রওয়ানা হইলেন। পথিমধ্যে সর্বত্র এমনকি মরুবাসী যাযাবরগণও তাঁহার কামালাতে মুগ্ধ হইয়াছিল।

স্বীয় পিতা ও মুর্শিদ হযরত মাওলানা শাহ্ কারামত আলী সাহেবের প্রধানতম খলিফা ও গদ্দিনশীন হিসেবে ২৭ বছর যাবৎ বাংলা ও আসামে হেদায়েত কার্য সুসম্পন্ন করতঃ কামালাতে যাহেরী ও বাতেনী দ্বারা বিশ্ব চরাচর আলোকিত করিয়া ১৩১৬ হিজরী, রমযানের ষষ্ঠ দিবস ১৩০৫ সালের ৬ই মাঘ বৃহস্পতিবার বেলা ১০-৪০ (মিনিটের সময় ঢাকা সদর ঘাটে স্বীয় বোটে (সফরের জন্য নির্মিত বড় নৌকা) ৬৬ বৎসর বয়সে অর্ধাঙ্গ রোগে আক্রান্ত হইয়া ইন্তিকাল করিলেন (ইন্নালিল্লাহি..... রাজিউন)।

ঢাকা মহানগরীর চক বাজার জামে মসজিদের দক্ষিণ পার্শ্বে তাঁহার মাজার শরীফ অবস্থিত। বর্তমানে প্রতিদিন বহুলোক তাঁহার মাজার শরীফ যিয়ারত করিয়া থাকেন।

সূচীপত্র

হাম্‌দ ২৭
না'ত ২৭
সূচনা ৩৩
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন ৩৪
প্রথম প্রকার ৩৪
দ্বিতীয় প্রকার ৩৫
উপদেশ ৪৩
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে সম্ভাষণ ৪৫
প্রথম উপকার ৪৫
দ্বিতীয় উপকার ৫৭
তৃতীয় উপকার ৫৯
চতুর্থ উপকার ৬০
আল্লাহ্ ওয়ালাদের সংসর্গ এবং ওয়াজ ও তা'লীম মানুষের মধ্যে খুব প্রভাব বিস্তার করে ৬১
প্রথম ওয়াজ ৬৪
উলামা এবং খলীফাগণের প্রতি এই বিষয়গুলি বিস্তারিত ব্যাখ্যার নির্দেশ........ ৬৫
বে-নামাযীকে কাফের বলা এবং তাহাদের জানাযা না পড়া খারেজীদের মাযহাব ৬৫
ওয়াজকারীর (বক্তার) প্রতি এই স্থানকে খুব পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করার নির্দেশ ৬৭
প্রথম উপকার ৬৭
দ্বিতীয় উপকার ৬৭
যাহারা লোকদিগকে মারিয়া ধরিয়া জরিমানা আদায় করে নিঃসন্দেহে তাহারা দাজ্জাল ৬৯
দ্বিতীয় ওয়াজ ৭৩
প্রথম উপকার ৭৩
দ্বিতীয় উপকার ৭৫
দ্বিতীয় উপকার দ্বিতীয় কথার বর্ণনার উপর ৭৫
তৃতীয় উপকার ৮২
চতুর্থ উপকার ৮৩

পঞ্চম উপকার ঃ নামাযের তাকিদ এবং তাছির-এর বর্ণনা ৮৪
ষষ্ট উপকার ঃ প্রথম তদবীরের বর্ণনা ৮৫
সপ্তম উপকার ঃ দ্বিতীয় তদবীরের বর্ণনা ৯০
হেকায়েত ৯২
অষ্টম উপকার ঃ যিনা হইতে বাঁচার জন্য ৯৩
নবম উপকার ৯৬
দশম উপকার ঃ শুধু মেয়েলোকদের জন্য নির্দিষ্ট ৯৬
হেকায়েত ৯৭
তৃতীয় ওয়াজ ৯৯
প্রথম উপকার ৯৯
দ্বিতীয় উপকার ১০০
আশ্চর্য কথা ১০২
প্রথম উপদেশ ১০৩
লতিফা ১০৩
হেকায়েত ১০৪
দ্বিতীয় উপদেশ ১০৫
তৃতীয় উপদেশ ১০৯
চতুর্থ উপদেশ ১০৯
তৃতীয় উপকার ১১১
প্রথম উপদেশ ১১১
দ্বিতীয় উপদেশ ১১২
তৃতীয় উপদেশ ১১৫
চতুর্থ উপদেশ ১১৮
পঞ্চম উপদেশ ১২৫
হেকায়েত ১২৫
চতুর্থ ওয়াজ (খাদেম এবং মুর্শিদের বর্ণনা) ১২৬
প্রথম উপকার ১২৬
দ্বিতীয় উপকার ১২৭
তৃতীয় উপকার ১২৯
চতুর্থ উপকার ১৩২
সংযোজন ঃ আ'মাল ১৪১

হাম্‌দ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ করিতেছি।

মহান ও পবিত্র আল্লাহ্‌র জন্য সমস্ত প্রশংসা, যিনি মানুষের জন্য দ্বীন এবং শরীআত নির্দিষ্ট করিয়াছেন। শরীআতের আদেশ-নিষেধ অর্থাৎ শরীআতের সমস্ত ফেকার মাস্‌আলা এবং শাখা-প্রশাখার সীমা নির্ধারণ করিয়া দিয়াছেন। সীমা লঙ্ঘন করিতে, বিরোধিতা করিতে নিষেধ করিয়াছেন। সমস্ত আদেশ পালন করিতে এবং সমস্ত নিষিদ্ধ কাজগুলি হইতে বিরত থাকিতে দৃঢ়বদ্ধ হওয়ার জন্য আদেশ করিয়াছেন। আর শরীআতের মূলনীতির উপর অর্থাৎ আকায়েদের (বিশ্বাসের) মাস্‌আলার উপর একমত ও একতাবদ্ধ থাকিতে আদেশ দিয়াছেন। আর শরীআতের মূলনীতির উপর একমত হওয়ার দরুনই চার মাযহাবের লোকদিগকে একদলভুক্ত "সুন্নাত ওয়াল-জামাআত" বলা হইয়া থাকে। দ্বীনের মূলনীতি হইতে বিক্ষিপ্ত, জামাআত হইতে বিচ্ছিন্ন ও মতভেদ করিতে নিষেধ করিয়াছেন এই জন্য যে, "আহ্‌লে সুন্নাত অল-জামাআত" ব্যতীত আরো ৭২টি দল আছে যাহারা আকায়েদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি করার দরুন তাহাদেরকে "আহলে-সুন্নাত ওয়াল-জামাআত বলা হইয়া থাকে, যেমন আল্লাহ্‌র দর্শন (দিদারে ইলাহি) লাভের ব্যাপারে চার মাযহাবের মনীষীগণ একমত কিন্তু বাকী ৭২ দল ভিন্নমত পোষণ করেন। শুধু এই মাস্‌আলার উপর ধারণা করিয়াই সমস্ত আকায়েদের মাস্‌আলার উপর তাহাদের আকীদা (বিশ্বাস) বুঝা যায়।

না'ত

আর আল্লাহ্‌র প্রেরীত রাসূল হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর আল্লাহ্‌র রহমত ও শান্তি বর্ষিত হউক। যিনি জামাআত হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার অপকারিতা সম্বন্ধে সম্যক অবগত হওয়ার জন্য ইরশাদ ফরমাইয়াছেনঃ "শয়তান মানুষের জন্য নেকড়ে বাঘ স্বরূপ; যেমন পাল হইতে বিচ্ছিন্ন বকরির উপর নেকড়ে বাঘ ঝাঁপাইয়া পড়ে তদ্‌রূপ

শয়তান জামাআত হইতে বিচ্ছিন্ন মানুষকে পথভ্রষ্ট করিবার জন্য ঝাঁপাইয়া পড়ে। এই জন্য আল্লাহ্ তাআলার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো ফরমাইয়াছেনঃ তোমরা 'জামাআত' হইতে বিচ্ছিন্ন হইও না এবং মুসলমানদের জামাআতে দলবদ্ধ হইয়া থাকাকেই জরুরী মনে করিবে। তিনি আরো বলিয়াছেনঃ "যে ব্যক্তি জামাআত হইতে এক পা পরিমাণ দূরে সরিয়া যাইবে সে যেন ইসলাম হইতে বহির্ভূত হইয়া গেল।" হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বংশধর ও সাহাবাগণ ধর্মের যে মূলনীতির উপর একতাবদ্ধ ছিলেন, যাহারা তাঁহাদের সুন্নাতের অনুসারী হইয়াছিল এবং তাঁহাদের জামাআতের অনুবর্তী হইয়াছিল তাহাদেরকে "সুন্নাত ওয়াল জামাআত" বলা হইয়া থাকে; তাহাদের জামাআত সমস্ত পথভ্রষ্ট জামাআত হইতে পৃথক এই যে সমস্ত পথভ্রষ্ট জামাআত, যাহারা ইসলামের দাবীদার তাহারা যদি তাহাদের দলের সমস্ত জনসাধারণ ও বিশেষ লোকদিগকে এবং তাহাদের সমস্ত কিতাবাদি একত্রে জমা করে আর আহলে 'সুন্নাত ওয়াল জামাআত' যদি তাঁহাদের দলের সমস্ত জনসাধারণ ও বিশেষ লোকদিগকে একত্র করে তাহা হইলে নিঃসন্দেহে সমস্ত পৃথিবীতে আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামাআত"-এর সমকক্ষ কোন দলই হইতে পারিবে না এবং "আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের" লোকই অত্যধিক হইবে।

অতঃপর সকলেরই এই দিকে লক্ষ্য করা কর্তব্য, যাহা এই অধম আলী জৌনপুরী যিনি কারামত আলী নামে পরিচিত, যিনি মুসলমানদের প্রতি সহানুভূতির নিদর্শনস্বরূপ অত্যাবশ্যকীয় দরকারী মাস্আলা নিজের কিতাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, যাহা দ্বারা জনসাধারণ মুসলমানের যথেষ্ট উপকার সাধিত হইয়াছে। কিন্তু আজকাল অধিকাংশ স্থানে দেখা যাইতেছে, দ্বীন ও ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা লোকদের খুবই কষ্টকর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং দুনিয়ার লোভে ধর্মের কাজ না করা ও তাজিয়া বাহির ইত্যাদির মত নানান শিরক কাজ করা ঢোল বাজান এবং বন্ধুত্বের খাতিরে হারাম কাজ হইতে বিরত থাকা খুবই কষ্টকর হইয়া পড়িয়াছে। যেমন তাহার পরিপ্রেক্ষিতে 'জামে সগীর' কিতাবে হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) হইতে হাদীস বর্ণনা করা হইয়াছে- হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ ফরমাইয়াছেনঃ

يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ اَلصَّابِرُ فِيْهِمْ عَلٰى دِيْنِهٖ كَالْقَابِضِ عَلَى الْجَمْرِ - (رواه الترمذى)

অর্থাৎ, "এমন এক সময় আসিবে যখন মানুষের ধর্মের হুকুম-আহ্‌কাম পালন করিতে এমন কষ্ট হইবে, যেমন জ্বলন্ত আগুনের অঙ্গার হাতে রাখিতে কষ্ট হয়।" (তিরমিযী শরীফ)

এই সময়ের কথা কি বলিব! যাহা হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময় হইতে বহু দূরবর্তী হইয়া গিয়াছে। যখন হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাত হয় তখন হইতেই মানুষের অবস্থা পরিবর্তন হইতে চলিয়াছে। যেমন হযরত আনাস (রাঃ) ফরমাইয়াছেনঃ হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাতের মাত্র অল্প কিছু দিনের মধ্যেই আমাদের অবস্থার পরিবর্তন হইতে আরম্ভ করিয়াছে। হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বরকতের সময় দূরবর্তী হওয়ার দরুন অন্ধকার নামিয়া আসিয়াছে। এই অন্ধকার সময়ের মধ্যে দ্বীনের উপর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ থাকিবার জন্য আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে সমস্ত হাদীসে সুসংবাদ দিয়াছেন ও করিয়াছেন সে হাদীস আমি এখানে লিপিবদ্ধ করিতেছি, যাহা লোকেরা শ্রবণ করিয়া নিজেদের সাহস বাড়াইবে ও ধর্মের উপর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ থাকিবে। হাদীসটি মেশকাতুল মাসাবীহ্‌তে হযরত আবূ হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ ফরমাইয়াছেনঃ

بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيْبًا وَسَيَعُوْدُ كَمَا بَدَأَ فَطُوْبٰى لِلْغُرَبَاءِ -

অর্থাৎ, "নিশ্চয়ই ইসলাম প্রথম অবস্থায় একা ও দরিদ্রতার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ লাভ করিয়াছে।" যথা- "ইসলাম প্রথমতঃ গরীব এবং মুসাফিরের মতই ছিল, যেমন মুসাফির বিদেশে অপরিচিত শহরে প্রথম ভ্রমণ করে তাহাকে কেহই চিনিতে পারে না এবং কেহ তাঁহাকে সাহায্যও করে না, এইরূপ ইসলামের প্রাথমিক যুগে ইসলাম ও মুসলমানদের অবস্থা ঐরূপ

ছিল, পরে আল্লাহ্ তাআলা ইসলাম ও মুসলমানদিগকে শক্তিশালী করিলেন এবং পৃথিবীর এমন জায়গা বাকী ছিল না যেখানে ইসলাম পৌছে নাই এবং সমস্ত ধর্মের উপর ইসলাম জয়ী হয় নাই। অবশেষে প্রথম যে অবস্থায় প্রকাশ পাইয়াছিল। সেই অবস্থায় পতিত হইবে। যাহারা এই অবস্থায় দ্বীনের উপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকিবে এবং কোরআন ও হাদীসের শিক্ষাকে আঁকড়ে ধরিয়া থাকিবে তাহাদের জন্য সুসংবাদ এবং কামিয়াবী।" (মুসলিম শরীফ)।

অধম বলিতেছে, মানুষের মধ্যে এইরূপ গাফলতী ও দুর্বলতা আসিবেই কিন্তু দ্বীনে-মুহাম্মদীর মধ্যে কোন প্রকার বিচ্ছিন্নতা আসিবে না। উহা কিয়ামত পর্যন্ত সমস্ত ধর্মের উপর জয়ী থাকিবে। কোরআন-হাদীস গ্রহণ করার অর্থ ফেকাহ্ শাস্ত্রের উপর আমল করা, এই কথা হাদীসের শরাহ "আশাআতুল লুমআত" কিতাবে পরিষ্কারভাবে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। প্রকাশ থাকে যে, জনসাধারণ যাহারা 'মুজতাহিদ' নয় তাহারা যদি ফেকাহ্ শাস্ত্রের উপর আমল না করিয়া নিজের রায় মতে কোরআন হাদীসের উপর আমল করিতে চায় তবে প্রত্যেক লোকের জন্য একটি করিয়া মাযহাব হইবে, যাহার দ্বারা দ্বীনের শান্তি শৃঙ্খলা ব্যাহত হইবে এবং মারামারি, লুটতরাজ, অন্যায়-অত্যাচার, গুনাহ্র কাজ প্রকাশ পাইবে, যেমন এই যুগে কিছু সম্প্রদায় এবং "লা মাযহাবী" লোকেরা ফাসাদ সৃষ্টি করিতে চাহিতেছে কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা তাহাদের ফাসাদকে নস্যাত করিয়া দিয়েছেন। তাহাদের প্রতি আফসোস যাহাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শয়তানের লস্কর বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন কিন্তু মানুষেরা তাহাদেরই অনুসরণ করে। আর মক্কা-মদীনায় দ্বীন কিয়ামত পর্যন্ত কায়েম থাকিবে, যাহার সংবাদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দিয়াছেন। কিন্তু লোকেরা সেখানকার অনুসরণ করে না বরং সেখানকার কথা শুনিলে জ্বলিয়া আগুন হইয়া যায়। সুতরাং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরোধিতা ইহার চেয়ে আর কি হইতে পারে? এই দিকে লক্ষ্য করিলে ইহা প্রতীয়মান হয় যে, মূলতঃ এই দুই সম্প্রদায় খারেজী মাযহাব হইতে সৃষ্টি হইয়াছে। যাহাদেরকে আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আলেমগণ প্রতিহত করিয়াছে। আর এই সম্প্রদায়কে ওহাবীও

বলা হয়। ওহাবী মাযহাব খারেজী মাযহাব হইতে উদ্ভূত। যেমন রদ্দুল মুহতার কিতাবের ৩য় খণ্ডে (বাবুল বাগাত) বিদ্রোহী পরিচ্ছেদে বর্ণনা করা হইয়াছে। তাহাদের আক্রমণ শুধু লুটতরাজ খুন খারাবী এবং তাহাদের মতবাদের ব্যতিক্রম লোকদিগকে কাফের বলিয়া ধারণা করে। যেমন এই যুগে আবদুল ওহাব নজদী[১], তাহার অনুসরণকারীরা মক্কা-মদীনার উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া লোকদেরকে ধোকা দেওয়ার জন্য নিজেদেরকে হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী বলিয়া প্রকাশ করে, কিন্তু তাহারা শুধু নিজেদেরকেই মুসলমান বলিয়া দাবী করে। আর যাহারা তাহাদের মতের বিরোধী তাহাদেরকে মুশরেক বলে এবং তাহাদের মতের বিরোধী হওয়ার দরুন আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাআত ও তাহাদের আলেমদিগকে হত্যা করা জায়েয মনে করে। এই কারণে আল্লাহ্ তাআলা তাহাদের শক্তিকে পরাভূত করিয়া মুসলমান সৈন্যদিগকে তাহাদের উপর জয়ী করিয়া দিয়াছেন (১২২৩ হিঃ)।

এই অধম বলিতেছে, উপরোক্ত কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুজেযা হিসাবে বলিয়াছেন, ঘটনাও ঐ রকম ফলিয়াছে। সুতরাং এই অবস্থায় ওহাবীদের ফেতনা-ফাসাদ হইতে বাঁচাইবার জন্য এবং মন্দ দূর করার জন্য আর যাহারা আল্লাহ্‌র নাফরমানী, খারাপ কাজ এবং বেদআতের মধ্যে ডুবিয়া রহিয়াছে ও দ্বীনের কাজ করিতে অলসতা ও গাফলতী করে তাহাদেরকে হুঁশিয়ার করার জন্য এই কিতাব **মুরাদুল মুরীদীনের** মধ্যে এমন কিছু উপদেশ নসীহত ও মাসআলা বর্ণনা করিয়াছি যাহার দ্বারা মানুষের সমস্ত সন্দেহ নিরসন হইবে এবং ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের অনিষ্ট হইতে মানুষ রক্ষা পাইবে। লোকেরা নামাযের খুব পায়বন্দ হইতে ও নামাযের সুফল উপলব্ধি করিতে পারিবে। আর আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদা মতে নিজেদের দ্বীন ও মাযহাবকে খুব শক্তিশালী

টীকাঃ ১. হেজাযের জায়গা ব্যতীত বাকী জায়গাকে নজদ বলা হইয়া থাকে। মেশকাতুল মাসাবীহ হাদীসে কিতাবে ইয়ামিন ও শামের অধ্যায়ে প্রথম পরিচ্ছেদের শেষের দিকে ইমাম বুখারীর রেওয়ায়েতে হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে হাদীস বর্ণনা করা হইয়াছে যে, হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ ফরমাইয়াছেনঃ নজদ হইতে ভূমিকম্প ও ফেতনা ফাসাদ আরম্ভ হইবে ও সেখান হইতে শয়তানের দল ও তাহার সাহায্যকারী বাহির হইবে।

করিতে পারিবে। নির্লজ্জ কাজ হইতে তওবা করিবে। আমানতের খেয়ানত, কাহারো হক নষ্ট করা এবং হারাম জিনিস খাওয়া ও হারাম উপায়ে জীবিকা উপার্জন করা ইত্যাদি সমস্ত প্রকার খারাপ কাজ হইতে তওবা করিবে; শরীআতের কোন মাসআলার মধ্যে সন্দেহ করিবে না; মেয়েলোকেরা পর্দা রক্ষার ত্রুটি, নিজের স্বামীর সহিত বেয়াদবি এবং তাহাদের আমানতে খেয়ানত এই সমস্ত কাজ হইতেও তওবা করিবে।

আর যাহারা মুর্শিদীর দাবী করে অথচ এখনও তাহাদের মুর্শিদ হওয়ার যোগ্যতা লাভ হয় নাই তাহাদেরকে লোকেরা ভালভাবেই চিনিতে পারিবে। না জানার দরুন যাহারা এইরূপ অযোগ্য মুর্শিদের হাতে বায়আত হইয়াছে তাহারা লজ্জিত হইয়া এইরূপ বায়আত হইতে তওবা করিয়া খাঁটি ও সত্য পীরের নিকট বায়আত হইবে। আর ঐ মিথ্যাবাদী মুর্শিদ নিজের মুর্শিদীর মরতবা বাড়াইবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতে থাকিবে এবং আমার এই কিতাবের বর্ণনা শুনিয়া অন্তর কাঁপিয়া উঠিবে ও চক্ষু হইতে অশ্রু নির্গত হইবে। আমার খলিফারা এই কিতাবখানা সঙ্গে রাখিবে এবং যখন যে বর্ণনা শুনাইবার প্রয়োজন হইবে উহাই শুনাইয়া দিবে। আর যাহাকে আল্লাহ্ তাআলা ইল্‌ম দিয়াছেন তিনি আমার এই বর্ণিত বিষয়বস্তুকে আরো প্রমাণাদি দিয়া বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিবে।

حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ وَعَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا

সূচনা

মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মর্যাদা না বুঝিবে এবং তাঁহার প্রকৃত অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিবে, তাঁহার প্রতি মহব্বত না রাখিবে ও তাঁহার সহিত সম্বন্ধ স্থাপন না করিবে এবং তাঁহার দ্বারে উপস্থিত না হইবে ততক্ষণ তাঁহার সুন্নাতের পুরোপুরি অনুসরণকারী কি করিয়া হইতে পারে? পরিণত মু'মিন কি করিয়া হইবে? আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্য লাভ কি করিয়া হইবে? বেলায়েত ও ছিদ্দীকিনদের মর্যাদায় কি করিয়া পৌছিবে? আর এই সমস্ত বিষয় দিয়া কিতাব ভরপুর রহিয়াছে। এই স্থলে আমি 'মাদারিজুন্ নুবুওয়াত" কিতাব হইতে সংগ্রহ করিয়া পরিষ্কারভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খোলাখুলি দর্শন লাভ ও তাঁহার সহিত মুখোমুখি কথাবার্তা ও তাঁহার কথাবার্তা শ্রবণ করার পদ্ধতি বর্ণনা করিতেছি। এই কথা বুঝে আসার জন্য আমি টীকা দিয়া দিয়া খুব ভাল ভাল বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করিয়াছি। আর অন্য কোন কিতাবের বিষয়বস্তু ইহাতে সংযোজন করা হইলে সেখানে ঐ কিতাবের নাম উল্লেখ করিব এবং যথাসম্ভব ঐ বিষয়বস্তুকে খুব পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করার জন্য চেষ্টা করিব, কেননা বর্তমান যুগে এই বিষয় লোকের নিকট অপরিচিত হইয়া পড়িয়াছে। আমার লেখার পর লোকে যদি এই বিষয়বস্তুগুলি হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করে তাহা হইলে ইহা সৌভাগ্য।

আমি আমার সন্তান-সন্তুতি, মুরীদ ও ভক্তদিগকে এই বিষয়গুলি ভালভাবে স্মরণ রাখিতে ও আমল করিতে উপদেশ দিতেছি। এই সমস্ত বিষয় হইতে আমার যে সমস্ত উপকার সাধিত হইয়াছে তাহা বর্ণনা করার সময়ও নাই এবং প্রয়োজনও নাই। সারকথা এই যে, আমি প্রকৃত মুসলমান হইয়াছি এবং মুকাম্মেল ঈমানও হাসেল হইয়াছে। ইহা আশ্চর্য নহে যে, আমি ইহার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে যাইয়া এবং আল্লাহ্র প্রেমে উন্মত্ত হইয়া এই কথা বলিয়া ফেলিতে পারি যে, আমার অবস্থা সাহাবাদের অবস্থায় রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে। যে ব্যক্তি আমাকে কোন সময় কষ্ট দিয়াছে কিংবা রাগান্বিত করিয়াছে সে যেন আমার ঐ সময়ের অবস্থা স্মরণ করে, তবে বিষয়গুলি বুঝিতে পারিবে, এই বিষয়গুলি দেখা ও শ্রবণ করার মধ্যে যথেষ্ট উপকার আছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে আন্তরিক সম্বন্ধ স্থাপন করা এবং তাঁহার দ্বারে সর্বদা উপস্থিত থাকার অবস্থা বর্ণনা করা হইতেছে। হে অন্বেষণকারী! যদি তুমি এই কথা বল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে আন্তরিক সম্বন্ধ স্থাপন করা এবং মহান দরবারে উপস্থিত হওয়ার অবস্থা আমরা জানিতে পারি না তবে আমরা কি রূপে ইহা লাভ করিতে পারি? তাহা হইলে এই কথা মনে রাখিবে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহিত আন্তরিক সম্বন্ধ দুই প্রকারে হইয়া থাকে।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন ঃ

প্রথমে জনাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন প্রকাশ্যভাবে হয়। দ্বিতীয়তঃ তাঁহার সঙ্গে সম্পর্ক আভ্যন্তরীণ বা ভিতরগতভাবে হইয়া থাকে। এখন এই দুই প্রকারের কথাই শ্রবণ কর। প্রথম প্রকার যাহা রাসূলের সঙ্গে বাহ্যিক সম্বন্ধ উহা আবার দুই প্রকার ঃ

প্রথম প্রকার ঃ রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে বাহ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করার জন্য তাঁহার পুরোপুরি অনুসরণ করা জরুরী। কিতাব ও সুন্নাত অর্থাৎ কোরআন-হাদীসের হুকুম পালন করার জন্য চার ইমাম ঃ ইমাম আবূ হানিফা (রহঃ), ইমাম মালেক (রহঃ), ইমাম শাফী (রহঃ) এবং ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) এই চার ইমামের কাহারও এক জনের মাযহাব গ্রহণ করিয়া সেই অনুপাতে কাজ করা। কেননা মুহাক্কেকীন আলেমগণ এই কথার উপর একমত হইয়াছেন যে, চার ইমামই সত্য এবং কেয়ামতের দিবস তাঁহারাই নাজাতপ্রাপ্ত বা মুক্তির অধিকারী। কাজেই যদি এই চার ইমামের মধ্যে কাহারও অনুসরণ না করা হয় তাহা হইলে জনাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন হইতে পারে না। হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিপূর্ণ অনুসরণ করার অর্থ নিজের সংকল্পের (আযীমাত)[১] উপর কাজ করিবে, অনুমতির (রুখসত)[২] দিকে লক্ষ্য করিবে না।

টীকাঃ ১ ও ২. শরীআতের হুকুম আমল করার জন্য দৃঢ় সংকল্প হওয়া যেমন- কাহাকেও কুফরী বাক্য বলার জন্য জবরদস্তী করা হইল, না করিলে হয়ত প্রাণ যাইতে পারে এমতাবস্থায় তাহার জীবন রক্ষার জন্য সে কুফরী বাক্য বলিতে পারে আবার নাও বলিতে পারে। যদি কুফরী বাক্য বলে তাহাকে আযীমত বলে, আর যদি না বলে তবে তাহাকে রুখসত বলে। শরীআত দুই পথই জায়েয রাখিয়াছে।

তবে রুখসতের উপর আমল করলেও জায়েয আছে এবং ইহা শরীআতের অন্তর্ভুক্ত হইবে। আমি তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র নৈকট্যলাভ এবং ছিদ্দিকীনদের মর্যাদা লাভ করার জন্য ইচ্ছা করিতেছি যাহা আমি নিজের জন্যও পছন্দ করি। আর এই নৈকট্যলাভ ও সত্যবাদিতার মর্যাদায় পৌঁছার জন্য শর্ত হইল নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আযীমাতের কাজগুলি করা, যেমন সফরের মধ্যে রোযা না রাখার জন্য শরীআত অনুমতি (রুখসত) দিয়াছে তাহার সহজের জন্য। আর যদি সে রোযা রাখে তবে আযীমাতের উপর আমল করিল, যাহার জন্য সে বড় মর্যাদা লাভ করিবে। হে অন্বেষণকারী! কোন্‌খানে আযীমাতের উপর আমল করিতে এবং কোন্‌খানে রুখসতের উপর আমল করিতে হইবে ইহা হয়ত তোমার বুঝে আসিবে না কিন্তু একজন আল্লাহ্‌র ওলী মুর্শিদ তোমার নফসের রোগগুলি ধরিয়া উহার সংশোধন করিয়া দিবে এবং যে সময় ও যে অবস্থায় যে আমল তোমার জন্য উপযুক্ত তাহা তিনি তোমাকে জানাইয়া দিবেন।

দ্বিতীয় প্রকার ঃ হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে যাহেরী সম্পর্ক স্থাপন করার জন্য যেরূপ প্রকাশ্য অনুসরণের প্রয়োজন যাহা উপরে বর্ণনা করা হইয়াছে, তদরূপ আন্তরিক মহব্বত পয়দা হওয়ার জন্য আভ্যন্তরীণ অনুসরণেরও প্রয়োজন রহিয়াছে। যাহারা মহব্বতের সঙ্গে তাঁহার অনুসরণ করিবে, তাহার স্বাদ ও মজা নিজের দিলের মধ্যেই অনুভব করিবে। শেখ আবুল গাইস ইবনে জামীল (রহঃ) ফরমান ঃ আমি হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মহব্বতের নিদর্শন আমার দিল, রূহ এবং শরীরের পশমে পশমে অনুভব করি যেমন অত্যধিক গরমের দিনে অত্যধিক পিপাসার সময় ঠাণ্ডা পানি পান করিলে সমস্ত শরীরে উহা অনুভূত হয় এবং সমস্ত ঠাণ্ডা হইয়া যায়। সুতরাং হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে প্রত্যেকেরই আন্তরিক মহব্বত রাখা অবশ্য করণীয় (ফরজে আইন), যেমন আল্লাহ্ তাআলা কোরআনে পাকের ২১ পারায় সূরায়ে আহযাবে ইরশাদ ফরমাইয়াছেন ঃ

اَلنَّبِىُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ (سورة الاحزاب: ٢١ پاره)

অর্থাৎ, "নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মু'মিনদের জন্য তাহাদের জানমাল ইত্যাদি হইতে শত শত গুণে মহব্বতের।" যেমন হযরত রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ ফরমাইয়াছেন ঃ

لَنْ يُّؤْمِنَ اَحَدُكُمْ حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ نَّفْسِهٖ وَمَالِهٖ وَوَلَدِهٖ ـ

অর্থাৎ, "তোমাদের মধ্যে কেহই পরিপক্ক (কামেল) মু'মিন হইতে পারিবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তোমাদের জান-মাল ও সন্তানাদি হইতে অত্যধিক প্রিয় না হই।" অতঃপর আমি যে মহব্বতের বর্ণনা দিলাম এইরূপ মহব্বত যদি তোমার মধ্যে অনুভূত না হয় তবে তুমি জানিয়া রাখ যে, তোমার ঈমান ক্রটিপূর্ণ, এখনও পাকা হয় নাই। তখন তুমি নিজের গুনাহের জন্য অনুশোচনা কর, তওবা কর এবং সর্বদা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্বরণের ইচ্ছা কর ও তাঁহার সম্মান কর এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাহা নিষেধ করিয়াছেন তাহা হইতে বিরত থাক এই আশার উপর যে, এইরূপভাবে তাঁহার মহব্বত পাইবে এবং তাঁহার সহিত হাশর হইবে। কেননা হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন ঃ "যে ব্যক্তি দুনিয়াতে যাহার সহিত ভালবাসা রাখিবে সে তাহার সহিত হাশরে উঠিবে।" নিশ্চয়ই তুমি বুঝিতে পারিয়াছ যাহা আমি প্রথম প্রকারের মধ্যে বর্ণনা করিয়াছি, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে যাহেরী সম্পর্ক স্থাপনের অসুবিধা হইলেও প্রকাশ্য শরীআতের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা আযীমাতের উপর আমল এবং নিজের জীবন ও মনকে তাঁহার মহব্বতে ডুবাইয়া দেওয়া এবং প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে তাঁহার সম্মান করার সঙ্গে সাহাবা, তাঁহার পরিবারবর্গকে (আহলে বাইত) সম্মান করা "রুহুল বয়ানের" বর্ণনা মতে হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তাজিমের মধ্যেই গণ্য হইবে।

মাওলূদ শরীফের আমল যদি অস্বীকার করা না হয় তবে উহার রহস্য পরিষ্কার। অর্থাৎ মাওলূদ শরীফের আমল দ্বারাও হযরতের সঙ্গে একপ্রকার সম্পর্ক স্থাপন হয়। দ্বিতীয় প্রকার আভ্যন্তরীণ সম্পর্ক যাহা অপ্রকাশ্য উহাও আবার দুই প্রকার।

প্রথম প্রকার ঐ অসামান্য আদর্শ ব্যক্তির সূরতকে সর্বদা নিজের নিকট হাজির বলিয়া মনে করিবে। উহার পথ হইল- যদি কোন সময় স্বপ্নে তাঁহার মুলাকাত নসিব হয় তাহা হইলে ঐ সূরত যাহা তুমি স্বপ্নে দেখিয়াছ তাহা নিজের কাছে হাজির রাখিবে। আর যদি কখনও তাঁহার মুলাকাত ও যিয়ারত নসিব না হইয়া থাকে, তাহা হইলে তোমার এমন ক্ষমতাও নাই যে ঐ প্রশংসিত সূরত হুবহু হাজির করিবে। তাহা হইলে হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্মরণ কর এবং তাঁহার উপর দুরূদ শরীফ পাঠ কর।

এই অধম বলিতেছে, হাদীসের কিতাব পড়িবার সময় এই কথা পরিষ্কারভাবেই পাওয়া যায় অর্থাৎ হযরতের কথা বারবার আসে- হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই কর্ম করিয়াছেন এবং হযরতের সম্মুখে এই কাজ হইয়াছে। তিনি এই কাজের হুকুম দিয়াছেন এবং এই কাজের নিষেধ করিয়াছেন, প্রত্যেক হাদীসে দুরূদ শরীফ আসে। ইলমে হাদীসের চর্চাকারীদের সঙ্গে হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এক বিশেষ সম্বন্ধ স্থাপন হইয়া যায় এবং বিশেষ বন্ধুত্ব স্থাপন হইয়া যায়, যাহা অন্য লোকের হয় না। সর্বদা পবিত্র অবস্থা বর্ণনা করা তাহাদের যিকিরের বস্তু হইয়া দাঁড়ায় এবং তাঁহার সিফাত ও হালাত জানার কারণে ঐ বরকতময় ব্যক্তির সঙ্গে তাহাদের একটা নির্দিষ্ট সম্পর্ক স্থাপন হইয়া যায়। সর্বদাই তাঁহার সৌন্দর্যময় উদাহরণ তাহাদের সম্মুখে ভাসিতে থাকে এবং তাহাদের কাল্পনিক সূরতের সঙ্গে আভ্যন্তরীণ সম্পর্ক আরো দৃঢ় হয়। যখন তাঁহার পবিত্র নাম উচ্চারণ করা হয়, তাহার স্বাদ তাহারা অন্তরে অনুভব করে এবং নামের শ্রেষ্ঠতা অন্তরে উপস্থিত হয় যাহা উপস্থিত পায় এবং তাহারা সর্বদাই দরবারে উপস্থিত থাকেন। এই সমস্ত বিষয়ে তাহাদেরকে হযরত সাহাবায়ে কেরামদের সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে। এই কথা 'মাদারেজুন্ নুবুওয়াত' কিতাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মহব্বতের নিদর্শন বর্ণনায় আছেঃ হে তালেব (অন্বেষণকারী)! তুমি হযরত রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্মরণ করার সময় এইরূপ ধারণা করিবে যেন তুমি তাঁহাকে সম্মুখে জীবিত অবস্থায় দেখিতেছ এবং তুমি তাঁহাকে সম্মান ও খ্যাতি, আদব ও ভয়-ভীতির সহিত

দেখিতেছ। একথাও স্মরণ রাখিবে হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাকে দেখিতেছেন এবং তোমার কথাবার্তা শ্রবণ করিতেছেন। অর্থাৎ হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্মরণ করার সময় এবং তাঁহার উপর দুরূদ পড়ার সময় খুব আন্তরিকতার সহিত পড়িবে। কেননা হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্ তাআলার সিফাতের সঙ্গে জড়িত ও আল্লাহ্ তাআলার সিফাতের পরিপক্ক বিকাশ। আর আল্লাহ্ তাআলার সিফাত তাঁহার মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছেন। আল্লাহ্ তাআলার সিফাতের মধ্যে এক সিফাত হইল যাহা হাদীসে কুদসীতে বর্ণনা করা হইয়াছে أَنَا جَلِيْسُ مَنْ ذَكَرَنِىْ অর্থাৎ, "যে আমার স্মরণ করে আমি সেখানে উপস্থিত হই।" আর হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সৎ গুণাবলীর কথা অনেক পাওয়া যায়। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গুণাবলী সম্বন্ধে জ্ঞাত হওয়াও এক প্রকার প্রসিদ্ধ গুণ। হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষের মধ্যে আল্লাহ্ তাআলাকে সবচেয়ে অত্যধিক চিনিতেন। হে অন্বেষণকারী! যদি তুমি এই গুণের দ্বারা তাঁহার নিকটবর্তী না হইতে পার তবে যদি তুমি কোন সময় তাঁহার কবর যিয়ারত করিয়া থাক ও পবিত্র রওযা মুবারক দেখিয়া থাক এবং যদি তোমার তাহার কথা স্মরণ হয় তবে তোমার মনে ঐ মর্যাদাশীল পবিত্র দরগাহের ছবি জাগরুক রাখিবে। যখন তাঁহার কথা মনে হয় তখন তাঁহার উপর দুরূদ শরীফ পড়িবে এবং তুমি এইরূপ প্রকাশভঙ্গী করিবে যেন তাঁহার পবিত্র রওযা মুবারকের নিকট সম্মান ও খ্যাতির সহিত দাঁড়াইয়া রহিয়াছ। এমনকি তোমার অন্তরে এইরূপ ধারণা জন্মাইবে যে তাঁহার রূহ তোমার নিকট উপস্থিত হইয়াছে। যদি তুমি রওযা মুবারক যিয়ারত না করিয়া থাক তাহা হইলে সর্বদা তাঁহার উপর দুরূদ শরীফ পড়িতে থাকিবে ও মনে মনে ধারণা করিবে যে, তিনি তোমার সালাম ও দুরূদ শ্রবণ করিতেছেন। আর এই অবস্থায় তুমি খুব আদবের সহিত থাকিবে এবং নিজের সাহস ও মনের আশা-আকাঙ্খা সব একত্র করিবে যেন তোমার একাগ্রচিত্তের দুরূদ তাঁহার নিকট পৌছে, আর মনের আশা আকাঙ্খাকে একত্র করাও বড় পুণ্যময় কাজ। আর তুমি নিজে নিজে লজ্জিত হইবে যে, তোমার স্মরণ ও দুরূদ পাঠ যেমন রূহ ছাড়া শরীরের মত, কেননা লোকেরা যে সমস্ত নেক কাজ করে তাহা একাগ্রচিত্তে করিয়া থাকে- এইরূপ আমল জীবিত; আর যে

আমলের মধ্যে অলসতা পাওয়া যায় ও অন্য দিকে ধারণা থাকে এইরূপ আমল মৃতপ্রায় আত্মশূন্য শরীরের মত। এই জন্যই হযরত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন ঃ

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

অর্থাৎ "নিয়তের উপরই কাজের ফলাফল নির্ভর করে।" পূর্ব পৃষ্ঠায় যাহা বর্ণনা করিলাম তাহা বোধ হয় তুমি ভালভাবেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছ। এখন তুমি ইহাই জরুরী মনে কর যে, ইহার মধ্যেই যথেষ্ট সৌভাগ্য ও বড় মর্যাদা নিহিত রহিয়াছে।

এই অধম বলিতেছে যাহার লতিফাসমূহের মূলে ভ্রমণ করার স্বর্গীয় ধ্যান ধারণা লাভ হইয়াছে, যাহার বর্ণনা জনকল্যাণে করা হইয়াছে- তাহার হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপস্থিতির ধ্যান-ধারণা খুবই সহজ হইয়া পড়িবে। অর্থাৎ লতিফা কল্‌ব হইতে আরশ এবং আরশের উপর ইত্যাদি জায়গায় যায় এইরূপে দায়েরায়ে ওজূদিয়া মেছালিয়ার সূরতের নক্‌শা যাহা অতি নিকেটই লিখিতেছি ঐ নক্‌শার মধ্যে যে রেখাকে বেতের এবং কাবা কাউসাইন নির্ধারণ করা হইয়াছে ঐ রেখা পর্যন্ত পৌছার জন্য যখন মুরাকাবা করিবে তখন অতি সহজেই জনাব রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উপস্থিতি তাহার উপর খুলিয়া যাইবে। আর ফয়েজে আমের (জনকল্যাণ) শেষে হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইশার পরে বায়আত করার মুরাকাবা লিখা হইয়াছে উহাও ঐ ব্যক্তির জন্য সহজতর হইয়া যাইবে।

দ্বিতীয় প্রকার আভ্যন্তরীণ সম্পর্ক স্থাপন করা ইহাই প্রকৃতপক্ষে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের মূল তত্ত্ব যাহা সৎগুণাবলীর দ্বারা পরিপূর্ণ। তাঁহার এমন হাকীকত যাহা সৌন্দর্য ও গৌরব দ্বারা পরিপূর্ণ। দয়া ও ক্রোধ উভয়ই এই মূল তত্ত্বের মধ্যে নিহিত আছে। ঐ মূল তত্ত্ব মহান ও ক্ষমতাশালী আল্লাহ্ তাআলার সৎগুণাবলীর দ্বারা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সৌন্দর্যময় এবং আল্লাহ্ পাকের নূর দ্বারা গোরবান্বিত। অর্থাৎ অনন্ত অসীম কাল পর্যন্ত স্রষ্টা ও সৃষ্টির সম্পূর্ণতা নিজকে ঘিরিয়া নিয়াছে। অস্তিত্বের পূর্ণ মর্যাদা লাভ করিয়াছে, অর্থাৎ অস্তিত্বের সম্পূর্ণ মর্যাদা তাঁহার মধ্যে বাহ্যিক, আভ্যন্তরীণ, হাকিকতে, হুকুমে, আমলে, প্রকাশ্যে, অপ্রকাশ্যে বিদ্যমান আছে। হে অন্বেষণকারী! যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি

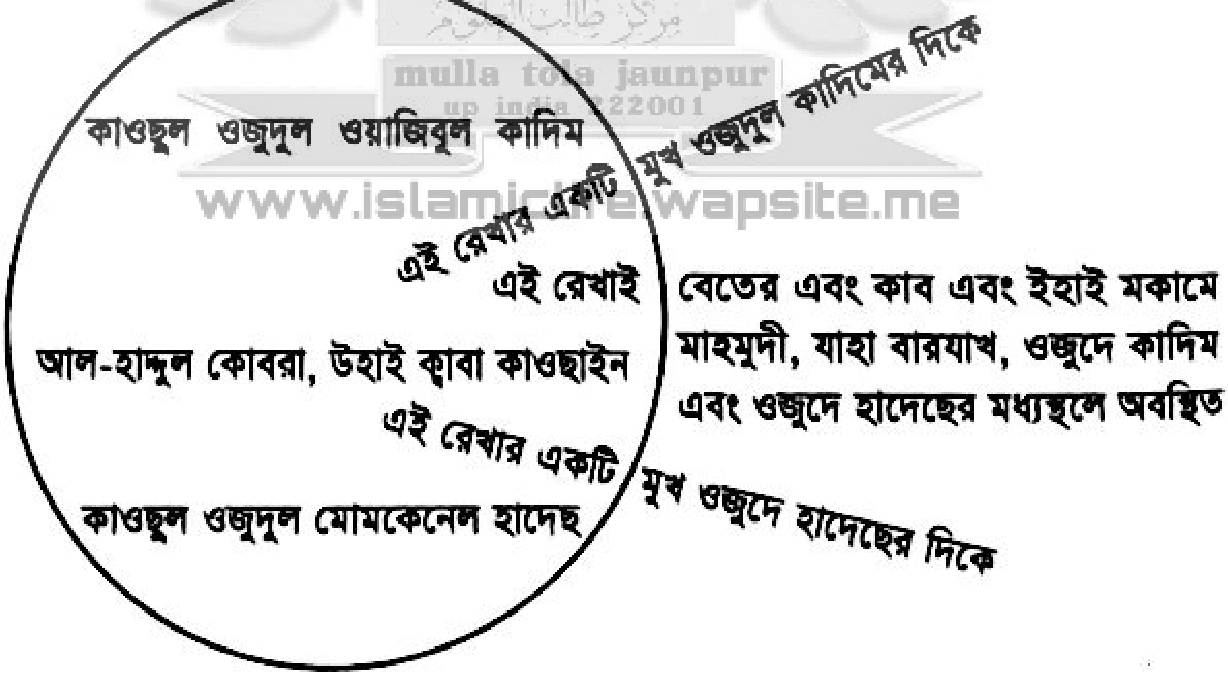
এই কথা জ্ঞাত হইবে না যে, রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পূর্ণ বরযাখে আছেন ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি তাঁহার মর্যাদা বুঝিতে সক্ষম হইবে না। অর্থাৎ তিনি প্রাচীনত্বের দিক দিয়ে, নূতনত্বের দিক দিয়া-হাকিকতের দিক দিয়া, প্রকৃতগত দিক দিয়া ও গুণগত দিক দিয়া, সর্বাবস্থায় বরযাখে আছেন। কেননা তিনি সৃষ্টজীব, তিনি পাক জাতের নূর নামসমূহ, গুণাবলী, কাজ-কর্ম হুকুমগতভাবে ও আসলগতভাবে উপস্থাপনকারী। এ জন্যই আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

ثُمَّ دَنٰى فَتَدَلّٰى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى

এই আয়াত শরীফের অর্থের মূল তত্ত্ব সমস্ত পবিত্র গুণাবলী পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করা হইতেছে। আমি তোমার বোঝার জন্য একটি উদাহরণ ও একটি নক্‌শা প্রকাশ করিয়া দিতেছি তুমি এই নক্‌শা দেখিয়া ঐ আয়াতের অর্থ নিজের ধ্যানে রাখিবে। প্রথমতঃ তুমি এই কথা জানিয়া রাখ অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকা ইহা সৃষ্টিকর্তার সিফাত বা গুণ আর সৃষ্টজীবের সমস্ত অস্তিত্ব গোল বৃত্তের মত মনে আসে। আর এই কথাও মনে ধারণা হয় যে, অস্তিত্ব দুই প্রকার প্রাচীনতম ও নূতনতম এবং উভয়ের মধ্যে অনর্থক একটা ব্যবধান মনে আসে এবং ঐ ব্যবধান একটা রেখার মত মনে ভাসে। তখন ঐ বৃত্তাকার বোধশক্তির উপর রেখা বোধশক্তি পতিত হওয়ায় ঐ গোলাকার বৃত্ত দুই ভাগ হইয়া ধনুকের সৃষ্ট করিল অর্থাৎ দুইটি কামানের রূপ মনে অঙ্কিত হইল। এই বোধশক্তি রেখাকে ধনুকের ছিলা বলে অর্থাৎ তার এবং ছিলা উভয়ের দ্বারা ধনুকের কথা বোধগম্য হইল। আর ঐ ধনুকের ছিলাকে কাবও বলা হয়। কাউসের অর্থ কামান এবং কাউসাইনের অর্থ দুই কামান। উক্ত রেখা ঐ বৃত্তকে দুইটি কামানের রূপ করিয়াছিল আর উপরের অর্ধেক যাহাকে প্রাচীনতম অস্তিত্ব কিংবা ওয়াজিবে ওজূদ বলা হইয়া থাকে অর্থাৎ যাহার অস্তিত্ব প্রয়োজনীয় অর্থাৎ আল্লাহ্ তাআলা। আর নীচের অর্ধেক যাহাকে নূতনতম অস্তিত্ব এবং সম্ভবপর ও সৃষ্টি বলা হয়। সুতরাং অস্তিত্বের বৃত্ত যাহা গুণবাচকে বিভক্ত হইয়া দুইটি ধনুক হইয়া গেল। কিন্তু জাতের পাক মহান পবিত্র আল্লাহ্ তাআলা, বিভক্ত হওয়া হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত। প্রকাশ থাকে যে, ঐ রেখা দুই কামানের সঙ্গে সম্পৃক্ত। তাহার এক মুখ প্রাচীন অস্তিত্বের দিকে আর একমুখ নূতন অস্তিত্বের দিকে। আর এই রেখা দুই অস্তিত্বের মধ্যে ভাসমান যেমন আরশে মুআল্লা শূন্য

জায়গার মধ্যে ভাসমান, তাহার একমুখ শূন্য জায়গার দিকে আর এক মুখ বাড়ি-ঘর ও সৃষ্ট জীবের দিকে। আর আরশ সমস্ত সৃষ্ট জীবের শেষ প্রান্ত উহার উপর কোন মাখলূকও নাই, কোন মাকামও নাই। উহার উপর লা-মাকাম যাহা উপরে বর্ণিত অর্ধেক বৃত্ত রেখার মধ্যে দাখেল। ইহাই উল্লেখিত রেখা আরশে মুআল্লা যা উপরে অবস্থিত, ইহাই কাবা-কাউসাইন রেখা এবং এই রেখাই 'মাকামে মুহাম্মাদী' যাহার বর্ণনা কোরআন শরীফে সূরায়ে নাজমের এই আয়াতের মধ্যে আছে فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى অর্থাৎ, "অতঃপর দুই কামানের মত কিংবা ইহা হইতে নিকটবর্তী"। আর ঐ মাকামে মুহাম্মাদীর নীচে সমস্ত মাকাম আর এইরূপ কেনইবা হইবে না কেননা সমস্ত মাকাম হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নূর মুবারক হইতে সৃষ্টি হইয়াছে। আর ঐ নূর মুবারক জাতে কাদীম অর্থাৎ আল্লাহ্ তাআলা সমস্ত সৃষ্টির প্রথমে সৃষ্টি করিয়াছেন। অতঃপর ঐ নূর মুবারক জাতে পাকের সঙ্গে এবং সমস্ত সৃষ্ট বস্তুর সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন হইল। তাঁহার নূর হইতে সমস্ত কিছু সৃষ্টি হওয়ার বর্ণনা ঐ হাদীসে পরিষ্কারভাবে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে যাহা 'মাওয়াহেব লিদ্দীনিহি'র মধ্যে হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ আনছারী হইতে বর্ণিত আছেঃ একদিন জাবের (রাঃ) হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে আরজ করিলেন, "হে আল্লাহ্‌র রাসূল (আপনার উপর আমার মা-বাপ কুরবান হউক) আমাকে সংবাদ দিন, আল্লাহ্ তাআলা সমস্ত কিছুর পূর্বে কি জিনিস সৃষ্টি করিয়াছেন?" হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ ফরমাইলেন ঃ "হে জাবের! আল্লাহ্ তাআলা সব কিছুর পূর্বে নিজের নূর হইতে তোমার নবীর নূর সৃষ্টি করিয়াছেন অর্থাৎ জাতে পাক (হাকিকী) হইতে নয় বরং সিফাতী (গুণবাচক) নূর হইতে এক নূর সৃষ্টি করিয়াছেন। অতঃপর ঐ নূর আল্লাহ্‌র মরজি মুয়াফেক যথাসম্ভব চলাফেরা করিতে লাগিলেন। আর ঐ সময় লাওহু কলম, বেহেশ্‌ত, জাহান্নাম, ফেরেশ্‌তা, আসমান- যমীন, চন্দ্র-সূর্য, জ্বিন-ইনসান কিছুই ছিল না। অতঃপর আল্লাহ্ তাআলা যখন সব কিছু সৃষ্টি করার ইচ্ছা করিলেন, তখন ঐ নূরকে চার ভাগে ভাগ করিলেন- প্রথম অংশ হইতে কলম, দ্বিতীয় অংশ হইতে লাওহ্, তৃতীয় অংশ হইতে আরশ এবং চতুর্থ অংশকে পুনরায় চার অংশে ভাগ করিলেন যাহার প্রথম অংশ ইহাতে আরশকে উত্তোলন করিবার ফেরেশ্‌তা, দ্বিতীয় অংশ হইতে কুরসী, তৃতীয় অংশ হইতে বাকী সমস্ত ফেরেশ্‌তাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন

এবং পুনরায় চতুর্থ অংশকে চার ভাগে ভাগ করিয়া প্রথম অংশ হইতে আকাশসমূহ, দ্বিতীয় অংশ হইতে যমীনসমূহ, তৃতীয় অংশ হইতে বেহেশ্‌ত-জাহান্নাম সৃষ্টি করিলেন। পুনরায় চতুর্থ অংশকে চার ভাগে ভাগ করিয়া প্রথম অংশ হইতে মু'মিনদের চক্ষের আলো সৃষ্টি করিলেন, দ্বিতীয় অংশ হইতে তাহাদের অন্তরের আলো সৃষ্টি করিলেন- উহাই আল্লাহ্ তাআলার মা'আরেফাত এবং তৃতীয় অংশ হইতে মু'মিনদের প্রীতি-ভালবাসার নূর সৃষ্টি করিলেন- উহাই কালিমায়ে তাওহীদ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ শেষ হাদীস পর্যন্ত। আর যেহেতু ঐ মাকামে মুহাম্মাদীর এক মুখ ওজূদে কাদীমের (প্রাচীন অস্তিত্ব) দিকে আর এক মুখ ওজূদে মুহদেছের (নূতন অস্তিত্ব) দিকে, এই কারণে মাকামে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মধ্যে সমস্ত খোদাই সম্পূর্ণতা এবং সমস্ত সৃষ্টির সম্পূর্ণতা বহিরগতভাবে ও ভিতরগতভাবে একত্রিত আছে। সৃষ্টির সম্পূর্ণতা প্রকাশ্যই দেখা যায় তাঁহার জাত হইতে সব কিছুই প্রকাশ হইতেছে। আর স্রষ্টার সম্পূর্ণতা ও জনাব রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁহার মূর্ত প্রতীক। আর যত স্রষ্টার সম্পূর্ণতা আছে সব কিছুই তাঁহার জাতের মধ্যে ছায়ার মত। এই কথা স্মরণ রাখিবে দুরূদ ও সালাম পাঠাইবার সময় হুজুরের উপস্থিতির মুরাকাবার মধ্যে এই সমস্ত বিষয়গুলি কাজে লাগিবে, এই সমস্ত বিষয়গুলি 'মাদারিজুন্ নুবুওয়াত' কিতাবের মূলকথা যাহা আমি বিস্তারিতভাবে লিখিয়াছি। আর সম্মুখে যাহা লিখিব ঐ কিতাবেরই বিষয়বস্তু বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিব।



স্রষ্টা এবং সৃষ্টির হাকীকতের বর্ণনায় বলা হয় যে, সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মধ্যস্থতার কারণ তিনিই সমস্ত কিছুর অস্তিত্বের মূল অর্থাৎ সমস্ত কিছু তাঁহার অস্তিত্ব হইতে সৃষ্টি হইয়াছে এবং তিনি সমস্ত হাকীকতের উর্দ্ধে। আর এই কারণেই শবে মে'রাজের সময় তাঁহার স্থান আরশে হইয়াছিল; আরশ সমস্ত মাখ্‌লূকাতের সীমা আর আরশের উপরে কোন সৃষ্ট বস্তু হইতে পারে না। আরশ ছিল হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নীচে, তাঁহার প্রভু তাঁহার উপর। হযরতের নিকটবর্তী ইছতেওয়া। ইছতেওয়ার অর্থ যে আরশ সমস্ত কিছুকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। সুতরাং ঐ আরশের উপর আল্লাহ্ তাআলার রহমত যাহা সমস্ত কিছুকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে, তাহারই প্রকাশ বরযাখ। আর হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে অনুভূত আকৃতিতে অর্থাৎ প্রকাশ্য আকৃতি যাহা জ্ঞানের দ্বারা অনুভূত হয়- বরযাখ ছিলেন। হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাতেনেও আছেন কেননা হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অস্তিত্ব হক তাআলা হইতে আর সৃষ্ট বস্তুর অস্তিত্ব হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হইতে। সুতরাং হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উভয় গুণে গুণান্বিত অর্থাৎ হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উভয় দিকে পাওয়া যায়- আল্লাহ্ তাআলার সিফাতের মধ্যে এবং মাখলূকের সিফাতের মধ্যে, প্রকাশ্য আকৃতিতে ও আভ্যন্তরীণ আকৃতিতে এবং হুকুমের দিক দিয়া ও জাতের দিক দিয়াও।

সুতরাং, হে অন্বেষণকারী! আমি উপরে যাহা বর্ণনা করিলাম তাহা সহজেই বুঝিতে পারিয়াছ। এখন তোমার জন্য কামালে মুহাম্মাদী হৃদয়ঙ্গম করা আশা করি খুব সহজতর হইয়া যাইবে।

উপদেশঃ হে অন্বেষণকারী! তুমি ভালরূপে এই কথা জানিয়া রাখ যে, হাকীকতে মুহাম্মাদীয়ার জন্য প্রত্যেক আলমে এক প্রকাশ আছে। ঐ আলমের অবস্থা বুঝিয়া অর্থাৎ কোন কিছুর ছায়া কোন বস্তুর উপর নিপতিত হয় ও প্রকাশ হয়। যেমন সূর্য ইত্যাদির ছায়া প্রজ্জ্বলিত লাকড়ি কিংবা কোন পাত্রে পড়ে, তবে তাহার পরিচ্ছন্নতার অনুপাতে উহা পানি এবং আয়নার মধ্যে পড়ে। এইরূপভাবে হাকীকতে মুহাম্মাদিয়ার প্রকাশ আলমের অবস্থা অনুপাতে হইবে। সুতরাং তাঁহার প্রকাশ আলমে জিসিমে যেরূপ হইবে

আলমে আরওয়াহের (আত্মার) মধ্যে সেইরূপ হইবে না। কেননা শরীর জগতে সংকীর্ণতা আছে। যে বস্তুর ধারণ ক্ষমতা আত্মার জগতে আছে শরীর জগতে সেই বস্তুর ধারণ ক্ষমতা নাই। আর তাহার প্রকাশ আত্মার জগতে (আলমে আরওয়াহ) ঐরূপ নয় যেরূপ আধ্যাত্মিক জগতে, কেননা আধ্যাত্মিক জগত আত্মার জগত হইতে খুব প্রশস্ত। আর তাঁহার প্রকাশ যমীনে ঐ রকম নয় যে রকম আসমানে এবং তাঁহার প্রকাশ আসমানে ঐ রকম নয় যে রকম আল্লাহ্‌র নিকট। আরশের উপরে যেখানে কেন ও কোথায় এই রূপ প্রশ্নের কোন স্থান নাই। প্রত্যেক জায়গায় তাঁহার প্রকাশ অতি উচ্চস্তরে এবং সম্পূর্ণ মুকাম্মেল নীচ হইতে উপরের মাকাম পর্যন্ত। তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব ও ব্যক্তিত্ব স্থান ও জায়গার অবস্থা অনুসারে প্রকাশ পায়। এমনকি হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রকাশ এমন স্থানে পৌছিয়াছে যেখানে কোন আম্বিয়া আউলিয়ার পৌছা কিছুতেই সম্ভব নয়। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন, আল্লাহ্ তাআলার সঙ্গে আমার এমনও সময় হয় যখন আমাকে বুঝা কষ্টকর হইয়া দাঁড়ায়, তখন একমাত্র আল্লাহ্ তাআলাই আমাকে চিনিতে পারেন। ঐ সময় কোন ফেরেশতা বা কোন প্রেরীত নবীও তাঁহার নিকটবর্তী হইতে পারে না। সুতরাং, হে ভাই! তোমরা সাহস বৃদ্ধি কর তাহা হইলে তুমি তাঁহাকে উচ্চস্তরের হাকীকতে কুবরার মধ্যে অর্থাৎ আল্লাহ্ জাল্লা শানুহুর অস্তিত্বের মধ্যে তাঁহার প্রকাশ দেখিতে পাইবে। মূলকথা তাঁহার সমুদয় বর্ণনা করা ক্ষমতার বাহিরে, অন্তর দিয়া তুমি বুঝিয়া লও।

এ অধম বলিতেছে যে, এই উপদেশের দ্বারা এই কথাই ভালরূপে বুঝা গেল যে, হাকীকতে মোহাম্মদীয়ার প্রকাশ প্রত্যেক জায়গায় সেই জায়গার অবস্থা অনুপাতে হইয়া থাকে। কাজেই তাঁহার উম্মতের মধ্যে তাঁহার সঙ্গে যে যেভাবে মহব্বত রাখিবে সে সেই ভাবে তাঁহার অনুসরণ করিবে। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তাআলার নামসমূহের মধ্যে, যে নামে আল্লাহ্ সৃষ্টিকর্তা বলিয়া বুঝায় ঐ নামের হুজুরী এবং মুশাহাদা হাসেল করিবে আর ঐ নামের সঙ্গে হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যেরূপ সম্বন্ধ আছে ঐ ব্যাপারে যে যতটুকু বুঝিতে পারিবে। হাকীকতে মুহাম্মাদীয়ার প্রকাশ তাঁহার নিকট সেইরূপ হইবে। হাকীকতে মুহাম্মাদীয়ার বর্ণনা আর ঐ নাম

যাহা সৃষ্টিজগতের প্রভূ উহাই শানুল-আলীম (জ্ঞানীর অবস্থা), উহার বর্ণনা ইনশা-আল্লাহ্ তাড়াতাড়িই করিব। আর শানুল আলীমের মুরাকাবা যখনই করিবে তখনই ঐ মুরাকাবার মধ্যে হাকীকতে মুহাম্মাদিয়া পাইবে। ঐদিকে লক্ষ্য করিয়া হে মুহাম্মাদ বলা যাইতে পারে। অতঃপর লেখক বর্ণনা করিতেছে এবং উপদেশ দিতেছে যে, হে ভাই তুমি তাঁহার আকৃতি ও আধ্যাত্মিক তাৎপর্য সর্বদাই নিরীক্ষণ কর যদি তোমার হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাজির হওয়ার খেয়াল অনিচ্ছাকৃতভাবে হাসেল হইয়া থাকে, তাহা হইলে অতিসত্বর তোমার রূহের সঙ্গে তাঁহার মহব্বত পয়দা হইবে, তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমার নিকট প্রকাশ্য ভাবেই হাজির হইবেন এবং তোমার সঙ্গে মুলাকাত হইবে ও তুমি তাঁহার সঙ্গে কথাবার্তাও বলিতে পারিবে, তাঁহার উত্তর শুনিতে পাইবে এবং তোমার নিকট হাদীসও বর্ণনা করিবেন এবং তোমার দিকে লক্ষ্য করিয়া কথাবার্তা বলিবেন এবং তুমি ছাহাবাদের মর্যাদায় পৌছিয়া যাইবে ও ছাহাবাদের সঙ্গে মিলিতে পারিবে ইনশাআল্লাহ্।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে সম্ভাষণ ঃ

প্রথম উপকারঃ এই অধম বলিতেছে উপরে তাম্বিহ (উপদেশ)-এর মধ্যে হাকীকতে মুহাম্মাদিয়া প্রত্যেক আলমে প্রকাশ হওয়া সম্বন্ধে বর্ণনা করা হইয়াছে। ঐ বিষয়বস্তু হৃদয়ঙ্গম করার পর তাঁহার আকৃতি ও আধ্যাত্মিক তাৎপর্য নিরীক্ষণ করার মুরাকাবা সহজ হইয়া যাইবে এবং জরুরী প্রয়োজন স্বীকৃত হইবে। নামায ও দুআর বর্ণনা হিসনে হাসীন ও মেশকাতুল মাসাবীহ্ ও দাওয়াতে মাসনূনার মধ্যে আছে। নিম্নের দুআর মধ্যে এই কথাগুলি আছে ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَسْئَلُكَ وَاَتَوَجَّهُ اِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ يَا مُحَمَّدُ اِنِّىْٓ اَتَوَجَّهُ بِكَ اِلٰى رَبِّىْ فِىْ حَاجَتِىْ هٰذِهٖ لِتَقْضٰى لِىْ اَللّٰهُمَّ فَشَفِّعْهُ فِىَّ-

অর্থাৎ, "হে আল্লাহ্ নিশ্চয় আমি তোমার নিকট আমার প্রয়োজন প্রার্থনা করিতেছি এবং তোমার নবীর ওসীলা দ্বারা তোমার দিকে আমার মনোযোগ

ফিরাইতেছি। হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রহমতের নবী। হে মুহাম্মাদ! সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিশ্চয়ই আমি আপনার ওসীলা দ্বারা আমার পরওয়ারদেগার প্রভূর দিকে মনোযোগ ফিরাইতেছি যেন আপনার ওসীলায় আমার মনোষ্কাম পূর্ণ হয়। হে আল্লাহ আমার জন্য তাঁহার শাফাআত কবূল কর।"

সুতরাং হাকীকতে মুহাম্মাদিয়া সর্বত্র প্রকাশ হওয়ার মুরাকাবা করিয়া ঐ হাকীকতের দিকে সম্বোধনকারী সাজিয়া হে মুহাম্মাদ! বলা যায়। আর এই রকম বলা শারে' (শরীআতের আইন-রচয়িতা) নিজেই শিক্ষা দিয়াছেন।

মরহুম মওলানা আবদুল হাকীম যিনি এই ফকীরের দোস্ত ও মুরব্বী দ্বীন ও মাযহাবের দিক দিয়া আমার সঙ্গে একমত, তাঁহার সমস্ত ইলেমের মধ্যে ফকীরের পূর্ণ আস্থা রহিয়াছে। তিনি নিজের কিতাব "নূরুল ঈমান" -এ আরবী ভাষায় যে বিষয়বস্তু লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা আমার এই বিষয় অর্থাৎ "হাকীকতে মুহাম্মাদীয়া প্রত্যেক জায়গায় বিরাজমান।" এই কথার মিল খুঁজিয়া পাওয়া যায়। তাঁহার অনূদিত 'দালায়িলুল খায়রাত' কিতাবেও এইরূপ দুআ লিখা হইয়াছে-"হে আল্লাহ্ আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেছি এবং তোমার দিকে মনে প্রাণে ধ্যান করিতেছি। তোমার হাবীবের ওসীলায় যিনি তোমার নিকট মাকবূল। হে হাবীব! হে মুহাম্মাদ! আমি আপনার প্রভূর নিকট আপনার ওসীলা দ্বারা প্রার্থনা করিতেছি। হে মহান রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপনি পবিত্র। হে আল্লাহ্ তুমি আমার জন্য তাঁহার শাফাআত কবূল কর। তাঁহার পদমর্যাদার কারণে, যে মর্যাদা তুমি তাঁহাকে দান করিয়াছ।" ফারেসী মালেকী তাহার শরাহ্‌র মধ্যে এই দুআ এইরূপভাবে উল্লেখ করিয়াছেন যেমন তিরমিযী রেওয়ায়েত করিয়াছেন ও বলিয়াছেন যে, এই হাদীস বর্ণনার অনুপাতে হাসান, সহীহ এবং গরীব। আর নাসায়ী, ইবনে মাজা, তাবরানী এবং ইবনে খাজিমাও সহীহ্ বলিয়াছেন এবং হাকেম রেওয়ায়েত করিয়াছেন ও বলিয়াছেন, এই হাদীস বুখারী ও মুসলিম শরীফের শর্ত অনুযায়ী সহীহ। বাইহাকীও এই হাদীসকে সহীহ বলিয়াছেন এবং হযরত উছমান ইবনে আফ্‌ফান হইতে রেওয়ায়েত করিয়াছেন। এই হাদীসের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে সম্বোধন করা হইয়াছে ঐরূপভাবে যেমন নামাযে

তাশাহ্হুদের মধ্যে বলা হইয়াছে ঃ হে নবী আপনার উপর আল্লাহ্র শান্তি ও রহমত বর্ষিত হউক। তাশাহ্হুদের মধ্যে যে ইয়া শব্দটি আছে উহা উপস্থিত লোকের জন্য ব্যবহার করা হয় হাজির শব্দটি ব্যবহারের মধ্যে রহস্য হইল, হাকীকতে মুহাম্মাদিয়া যেমন সর্বত্র বিরাজমান, বাতেনেও তিনি প্রত্যেকের নিকট হাজির। আর তাঁহার উপস্থিতির অবস্থা পুরাপুরি পরিষ্কারভাবে খুলিয়া যায় নামাযের মধ্যে। সুতরাং নামাযের মধ্যেও সম্বোধন করার সুযোগ মিলিয়া যায় এবং নামাযে মুখামুখি কিছু কথা বলার মাকাম হাসেল হইয়া তখনই হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করা হয়। আর কোন কোন মারেফাত পন্থী বলিয়াছেন- যখন বান্দা তাঁহার প্রভূ আল্লাহ্ তাআলার (ছানা) প্রশংসা করেন তখন যেন আল্লাহ্ তাআলার দরবারে প্রবেশ করার অনুমতি পাইয়া যায় আর দিলে ও চক্ষে যেন জ্যোতি দেওয়া হয়। এবং তিনি যেন দোস্তের মহলে দোস্তকে পাইয়া গেলেন অর্থাৎ আল্লাহ্ সুবহানাহুর দরবারে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পাইলে তখন তাঁহার দিকে মনোযোগী হয় এবং নিজ মুখকে তাহার দিকে ফিরাইয়া বলে اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ এই পর্যন্ত “নূরুল ঈমান” কিতাবের বিষয়বস্তু সমাপ্ত হইল। এই বিষয়ের পরে আত্তাহিয়্যাতুর মধ্যে সম্বোধন বাচক যে শব্দটি আছে তাহার যে অনুসন্ধান কার্য করা হইয়াছে উহার আর বর্ণনা করার প্রয়োজন নাই। অতঃপর উহার অনুসন্ধান করার পর লেখা হইতেছে- রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করা আর তাঁহার ওসীলা দ্বারা সাহায্য কামনা করা ঐ এ'তেকাদের (বিশ্বাস) পরিপন্থী; যেমন বলা হইয়া থাকে যে, আল্লাহ্ তাআলার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই আলমের পরিচালনা করার চেষ্টাকারী অর্থাৎ এইরূপ বিশ্বাস স্থাপন করা যে হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্ তাআলার নিকট হইতে এই পৃথিবী পরিচালনা করার প্রতিনিধিত্ব লাভ করিয়াছেন এবং এই পৃথিবী পরিচালনার জন্য আল্লাহ্ তাআলার প্রতিনিধির দরকার কিংবা এই ধরনের বিশ্বাস করা যে, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সব কিছু দেখেন এবং শুনেন যেমন আল্লাহ্ তাআলা দেখেন ও শুনেন। নিঃসন্দেহে এই ধরনের বিশ্বাস বর্জনীয় এবং ইহা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের এ'তেকাদের (বিশ্বাস)

সম্পূর্ণ বিপরীত। আমাদের আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের এ'তেকাদ (বিশ্বাস) হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমস্ত সৃষ্টির সেরা, তিনি সৃষ্টি না হইলে সমস্ত সৃষ্টজীব সৃষ্টি হওয়া এবং আল্লাহ্ তাআলার নিকট সমস্ত মাখলূকাতের আশ্রয় নেওয়া কিছুতেই সাব্যস্ত হইত না।

এই বিষয় উপরে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, হাবীবের স্থানে হাবীবকে পাওয়া যাইবে এবং তৎপূর্বে মাদারেজুন্ নুবুওয়াতের মধ্যেও এই বিষয় বর্ণনা করা হইয়াছে। আমি তোমাদিগকে উপদেশ দিতেছি, হে ভাই! তুমি সর্বদা তাঁহার আকৃতি ও তাঁহার আভ্যন্তরীণ তাৎপর্যের দিকে দৃষ্টি রাখ যদিও তোমার হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপস্থিত হওয়ার খেয়াল অনিচ্ছাকৃতভাবেই আসিয়া যায়। আর এই বিষয়ের শক্তি যোগায় হযরত খাজা মুঈনউদ্দীন চিশতী (রহঃ)-এর ঐ কথা যাহা তিনি 'আখবারুল আখইয়ারে'র মধ্যে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ঃ কাজী মুহিউদ্দীন কাশানী হযরত শেখ নিজামউদ্দীন (রহঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, মুরীদের মুরাকাবা করা জনাবের ও পয়গাম্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এবং মুর্শিদের প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন করা উচিত, না একত্রে? তিনি উত্তরে বলিয়াছেন, একত্রেও করা যাইতে পারে এবং ভিন্ন ভিন্ন করা যাইতে পারে। যদি তুমি একত্রে করিতে চাও, তবে এইভাবে করিবে- তুমি খেয়াল করিবে যে, আমি আল্লাহ্ তাআলার সম্মুখে উপস্থিত আর পয়গাম্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার ডান দিকে এবং মুর্শিদ আমার বাম দিকে। আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাজির হওয়ার মুরাকাবা এমন একজন বিজ্ঞ তরীকতের ইমামও শিক্ষা দিয়েছেন এবং ইহাকে উপকারী বলিয়াও নির্দেশ দিয়াছেন। তাহা হইলে এখন দেখা যায় হযরত মুহাক্কেক দেহলভী রহমাতুল্লাহ আলাইহির শিক্ষা এবং হযরত শেখ নিজামউদ্দীন আউলিয়া (রহঃ)-এর তালীম এক এবং ইহাও সাব্যস্ত হইল যে, এই রকমের মুরাকাবা এবং খেয়াল সম্ভবপর। এখন হাকীকতে মুহাম্মাদিয়া কি জিনিস তাহা শ্রবণ কর। প্রথমে এই কথা জানিয়া রাখ صِفَت এর বহু বচন صِفَات (গুণ-এর বহু বচন গুণাবলী) এবং شَان এর বহু বচন شُيُوْن (যেমন জাকজমকপূর্ণ অবস্থা) সুতরাং আল্লাহ্ তাআলার সিফাত (গুণাবলী) যাহা আছে তাহা বাহিরের দিকে দেখা যায় অতিরিক্ত জিনিসের মধ্যে অর্থাৎ আল্লাহ্ তাআলার জাতের মধ্যে নহে, জাত হইতে পৃথক। আর শান যাহা

বিশ্বাসের যোগ্য অর্থাৎ যাহা আল্লাহ্ তাআলার জাতের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখে। আর শানের অবস্থা এই সমস্ত ছিফাত আল্লাহ্র জাতের মধ্যে বিদ্যমান আছে এবং আল্লাহ্ তাআলার জাত হইতে ইহা বাহিরে নয়। এই কথার উপর এখানে একটি উদাহরণ আসিয়া যায়, উদাহরণটি হইল ঃ পানির স্বভাব উপর দিক হইতে নীচের দিকে প্রবাহিত হওয়া কিন্তু নীচের দিক হইতে কখনও উপরের দিকে যায় না। যতক্ষণ পর্যন্ত পানির এই স্বভাব বাহিরে দেখা না যাইবে ততক্ষণ পর্যন্ত ঐ স্বভাবকে পানির জাতের মধ্যে খেয়াল করিবে এবং জরুরী মনে করিবে, তাহা হইলে এই গুণকেই শুয়ূন বলা হয়। আর যখন ঐ গুণের প্রকাশ পানির অভ্যন্তরে হইবে তখন এই প্রকাশকে 'সিফাতে যায়েদা' বলা হইবে। পানির জাতের জন্য হযরত মোজাদ্দেদ (আল্লাহ্ তাঁহাকে পবিত্র করুন) তাঁহার লিখিত কিতাবসমূহের মধ্যে সংক্ষিপ্তভাবে তাহার বর্ণনা করিয়াছেন। যাহার সিফাত ও শানের হাকীকত বোঝা গিয়াছে। আমি এখানে তাঁহার লিখিত মাকতূবাতে দাবিস্ত ও নহম হইতে সংক্ষিপ্ত করিয়া এখানকার উপযুক্ত হিসেবে ব্যাখ্যা করিয়া লিখিয়া দিয়াছি এখন ভালরূপে বুঝিয়া লও।

জানিয়া রাখা দরকার ব্যক্তির হাকীকতের উদ্দেশ্য তায়িনে উজূবী। আর তায়িনে উজূবী আল্লাহ্ তাআলার নামসমূহের মধ্যে এক নাম যেমন- عَلِيْم، قَدِيْر، مُرِيْد، এবং مُتَكَلِّم ইত্যাদি অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার এক এক ইসিম হইতে এক এক ব্যক্তির জন্ম হইয়াছে যেমন ঐ ইসিমই ঐ ব্যক্তির প্রকাশ অর্থাৎ ইসিমের গুণাবলী প্রকাশ হইতেছে। এই কথার হাকীকত হইল- পবিত্র ও মহান আল্লাহ্ তাআলা তাঁহার নামসমূহ হইতে এক নাম এক ব্যক্তির জন্য নির্দিষ্ট করিয়াছেন যে, ঐ ব্যক্তির আসল ও হাকীকতে এই নাম এবং এই ব্যক্ত নামের প্রকাশ যেন ঐ নামের গুণাবলী ঐ ব্যক্তির মধ্যে প্রকাশ পায়। আর ঐ নামই তাহার প্রভূর নাম। মোটকথা আমি এখন বলিতেছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মত অন্যান্য আল্লাহ্র সৃষ্টজীবও আলমে খাল্কের মধ্যে মিশ্রিত হইয়াছে এবং আলমে আমরের মধ্যেও। আর আলমে খাল্ক হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলা হয় এবং আলমে আমরে তাঁহাকে আহমদ বলা হয়। আর আলমে খাল্ক শরীর জগতকে বলা হয় এবং আলমে আমর

ফেরেশ্‌তাদের রূহের জগতকে বলা হয়। পবিত্র আল্লাহ্ তাআলার ইসিম যাহা তাঁহার সৃষ্টজগতের শানুল আলীম যাহা তাঁহার আলমে আমরের লালন-পালন করে। সুতরাং উহাই আভ্যন্তরীণ যাহা শানুল আলীমের বিশ্বাসের অস্তিত্বের শুরু এবং আসল। আর এই কথা পরিষ্কার বুঝা যায় যে প্রত্যেক বস্তুর আভ্যন্তরীণ ভাগই সবচেয়ে মনোরম হয়, তাহাই হাকীকতে মুহাম্মাদীর উদ্দেশ্য আর ঐ শানুল আলীমের অর্থ আর পবিত্র আল্লাহ্ পাকের কা'বার হাকীকতের অর্থ একই। তাহা হইলে হাকীকতে আহমদী ও পবিত্র আল্লাহ্ পাকের কা'বার হাকীকত একই সাব্যস্ত হইল। কাজেই আল্লাহ্ পাকের কা'বা হুবহু হাকীকতে আহমদী যাহা আসলে হাকীকতে মুহাম্মাদীর ছায়া। এই কারণেই আল্লাহ্ পাকের কা'বার হাকীকত যাহা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উচ্চ হইতে নীচে আসার শেষ সীমা পর্যন্ত সর্বত্রই পবিত্রতায় অবতীর্ণ হইতেছেন। আর আল্লাহপাকের কা'বার হাকীকত হুবহু হাকীকতে আহমদী। সুতরাং আল্লাহ্ পাকের কা'বার হাকীকত উচ্চ শিখরে আরোহণ করিতে পারে না। আর হাকীকতে মুহাম্মাদিয়া যখন পবিত্রতার উচ্চ শিখরে আরোহণ করিতেছেন তখন হাকীকতে আহমদী কা'বায়ে রব্বানির উচ্চ শিখরে আরোহণ করার শেষ সীমা। উহা উচ্চে আরোহণ করার প্রথম সিড়ি। হাকীকতে মুহাম্মাদী হাকীকতে আহমদীর উপরে আরোহণ করিতেছে অর্থাৎ হাকীকতে আহমদীতে তাহার হাসেলই আছে তাহার উপরে যখন সে আরোহণ করিতেছে তখন ঐ সিড়ির পরে হাকীকতে মুহাম্মাদীতে আরোহণ করিতেছে এবং তাহার শেষ সীমা মহান ও পবিত্র আল্লাহ্ তাআলা ছাড়া কেহই জানে না। এই অবস্থায় হাকীকতে মুহাম্মাদীই সর্বাধিকার অর্থাৎ আগে হইল। তাই হইলে যদি কা'বা হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হইতে বরকত হাসেল করিতে প্রত্যাশিত হয় তাহাতে আশ্চর্যের কি আছে? সুতরাং হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই আলমে খালকে (সৃষ্টজগতে) প্রকাশ হওয়ার দরুন কা'বা শরীফের যে ফায়েদা ও বরকত লাভ হইয়াছে ইহার দ্বারা ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, যাহার বর্ণনা 'মাদারিজুন্ নুবুওয়াত' কিতাবে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে, তাঁহা খুব মনোযোগ দিয়া শোন। আবদুল মুত্তালিব হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলিয়াছেন হযরতের জন্মের সময় আমি কা'বা ঘরের নিকট ছিলাম। যখন অর্ধ রাত্র হইল তখন দেখিতে পাইলাম কা'বা

ঘর মাকামে ইব্রাহীমের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে ও সেজদা করিতেছে এবং তাহার মধ্যে হইতে এইরূপ তাকবীরের শব্দ আসিতে লাগিল اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ আল্লাহ্ খুব বড়, আল্লাহ্ খুব বড় মুহাম্মাদ মোস্তফার প্রতিপালক এখন আমাকে আমার প্রভূ ভূত-মূর্তির অপবিত্রতা হইতে এবং মুশরিক (অংশীবাদী)-দের নাপাকী হইতে সম্পূর্ণ পবিত্র করিয়াছেন।

ঐ কথাগুলি এমন জায়গায় বলিয়াছেন যখন তাঁহার উম্মতের বড় কামেল-আউলিয়াগণ হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মর্যাদার উচ্চ শিখরে আরোহণ করার মধ্যে তাহাদের পুরা অংশ মিলিয়াছে। এই জন্য কাবা যদি এই সমস্ত বুযুর্গদের নিকট হইতে বরকত নেওয়ার জন্য মুখাপেক্ষী হয় তাহাতে আশ্চর্যের কি আছে? আর হযরত আদম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম হইবার পূর্বেই হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নুবুওয়াত লাভ করিয়াছিলেন যাহার সংবাদ খোদ নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দিয়াছেন। তিনি ইরশাদ ফরমাইয়াছেন, আদম (আঃ) যখন পানি ও কাদার মধ্যে ছিলেন তখন আমি নবী ছিলাম অর্থাৎ আলমে আরওয়াহ্‌র (আত্মার জগতে) মধ্যে ছিলাম। সুতরাং ঐ নবুওয়াত হাকীকতে আহ্‌মদী অনুযায়ী ছিল যাহা আলমে আমরের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখে। আর রূহানী জগতে হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাম আহমদ ছিল। এই জন্য হযরত ঈসা (আঃ) যিনি كَلِمَةُ اللّٰهِ আল্লাহ্‌র কালিমা ছিলেন এবং তাঁহার আলমে আরওয়াহ্‌র (আত্মার জগত) সঙ্গে সম্বন্ধ ছিল। তিনি হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দুনিয়ায় আগমনের সুসংবাদ আহমদ নাম দ্বারাই দিয়াছেন যেমন আল্লাহ্ পাক কোরআনে পাকে ইরশাদ করিয়াছেন—

وَمُبَشِّرًا بِرَسُوْلٍ يَّاْتِىْ مِنْۢ بَعْدِى اسْمُهٗۤ اَحْمَدُ

অর্থাৎ "আমার পরে সুসংবাদ প্রদানকারী একজন রাসূল তোমাদের মধ্যে আগমন করিবেন যাঁহার নাম হইবে আহমদ।" হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াত যাহা মৌলিক উপাদানসম্ভূত, জন্মের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন হাকীকতে মুহাম্মাদীর অনুপাতে অর্থাৎ দুই হাকীকতের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত ছিলেন। তাঁহার প্রভূ এই মর্যাদার মধ্যে ঐ শানুল আলীম আর শানুল আলীম হইল বিশ্বাসযোগ্য অস্তিত্বের শুরু। এইজন্য এবারের

দা'ওয়াত প্রথম বারের দা'ওয়াত হইতে অনেক বেশী দায়িত্বপূর্ণ কেননা প্রথমবারের দা'ওয়াত আলমে আমরের সঙ্গে নির্দিষ্ট ছিল। আর তাঁহার লালন-পালন ঐ আলমের মধ্যে শুধু রূহদের জন্য ছিল। তখন তাঁহার দা'ওয়াত আলমে খাল্ক (সৃষ্টিজগত) ও আলমে আমর উভয়ের মধ্যে শামিল। আর তাহার লালন-পালন শরীর এবং রূহ উভয়ের মধ্যে শামিল কিন্তু পার্থক্য শুধু ঐ আলমের (জগতে) মধ্যে তাঁহার মৌলিক উপাদান সমস্ত জন্ম জয়ী ছিল আলমে আমরের জন্মের উপরে, তাহা হইলে এই সম্বন্ধ সৃষ্টির মধ্যে ফায়দা দিতে ও গ্রহণ করিতে খুব সুবিধা হইবে। কেননা খালায়েকের (সৃষ্টির) মধ্যে বাশারিয়াত (মনুষত্ব) অধিক প্রবল। আল্লাহ্ তাআলা তাঁহার হাবীবকে তাকিদের সহিত আদেশ দিয়াছেন যে, তুমি নিজের বাশারিয়াত (মানবতা)-কে প্রকাশ কর। আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করিয়াছেন–

قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰى اِلَىَّ

অর্থাৎ "হে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপনি বলিয়া দিন, আমিও তোমাদের মত একজন মানুষ কিন্তু শুধু এতটুকু পার্থক্য যে, আমার নিকট আল্লাহ্র তরফ হইতে ওহী আসে।" যখন এই দুনিয়া হইতে হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিদায় হইলেন তখন রূহানিয়াতের (আত্মার) দিক প্রবল হইল আর বাশারিয়াতের (মানুষ) সঙ্গে সম্বন্ধ কম হইল এবং দা'ওয়াতের নূরের মধ্যে তারতম্য প্রকাশ পাইল। সুতরাং কোন কোন সাহাবায়ে কেরাম বলিয়াছেন যে, এখনও আমরা হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাফন-কাফন সমাপ্ত করিয়া সারিতে পারি নাই অথচ আমাদের মনে তারতম্যের ভাব পরিলক্ষিত হইল। সত্যকথা প্রত্যক্ষ ঈমান পরোক্ষ ঈমানে পরিবর্তিত হইল। কাজ-কর্ম শৃঙ্খলা হইতে বিশৃঙ্খলার দিকে চলিল এবং দেখার চেয়ে শুনার গুরুত্বই হইল বেশী।

এই সমস্ত বিষয়বস্তু ঐ কিতাবের। এখানে বুঝাইবার জন্য আমি কিছু কথা ব্যাখ্যাস্বরূপ বৃদ্ধি করিয়াছি। এখন আরো একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে অন্যান্য সমস্ত মাখলূকাত সৃষ্টি হইয়াছে সিফাতি নামের ছায়া হইতে আর হযরত রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম হইয়াছে খোদ শানুল আলীম হইতে। অতঃপর একথাও জানা দরকার যে,

নিঃসন্দেহে শানুল আলীম প্রত্যেক জায়গায় বিদ্যমান এবং শানুল-আলীম হইতে পবিত্র আল্লাহ্ তাআলার জাতের সঙ্গে এক সম্পর্ক আছে এই ভাবেই জাতে মোকাদ্দাস শানুল-আলীম আর এই অবস্থাই হইল হাকীকতে মুহাম্মদিয়ার। আর হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুবারক অস্তিত্ব হইতে অর্থাৎ হাকীকতে মুহাম্মদিয়া হইতে একটি সম্পর্ক আছে। সুতরাং ঐ শানের দিকে মুখ ফিরান আর আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দিকে মুখ ফিরান একই কথা। এই প্রকারে যদি কোন ব্যক্তি হযরত সূফীদের নিকট মুরীদ হইয়া তরীকায় প্রবেশ করে যাহার সিলসিলা হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত মিলিত হইয়াছে এবং যাহার ব্যাখ্যা مَدَارِجُ السَّالِكِين اِلٰى رُسُوم تريق العَارِفِين কিতাবের প্রথম অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। অর্থাৎ- কমপক্ষে মুরীদের যে বিষয় হাসেল হয় (যখন ঐ ব্যক্তি মুরীদ হইয়া হযরত সূফীগণের সিলসিলায় প্রবেশ লাভ করে) তাহা হইল এই- যখন নিজের হালকাকে হেলাইবে তখন তাহাকে ওলী আল্লাহ্দের আত্মা টানিতে থাকে তাহার মুর্শিদ হইতে আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত, সেখান হইতে আল্লাহ্ জাল্লা শানুহুর দরবার পর্যন্ত। সুতরাং যে ব্যক্তি হযরত সূফীয়ায়ে কেরামদের সিলসিলায় প্রবেশ করিয়া মুরীদ হয় নাই তাহারা ঐ লোকদের দলভুক্ত বলিয়া গণ্য হয় না। আর যখন ঐ ব্যক্তি স্বতন্ত্রভাবে নিজের হালকা হেলাইবে, তখন কেহই তাহার উত্তর দিবে না অর্থাৎ তাহাকে ওলীগণ নিজের দিকে টানিবে না। ঐ কিতাবের অধ্যায়ে ইহাও লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে যে, সমস্ত নেককার লোক অর্থাৎ সল্ফেসালেহীন এবং তরীকার পীরগণ এই কথার উপর একমত হইয়াছেন যে, যে ব্যক্তি তাহার মুর্শিদের নছব ও সিলসিলা সম্বন্ধে জ্ঞাত নয় সেই ব্যক্তি অকেজো, তাহার তরীকার মধ্যে কোন মুরব্বি নাই।

এই অধম বলিতেছে, যে ব্যক্তি কাহারো মুরীদ হইয়াছে অথচ তাহার মুর্শিদের সিলসিলা সম্বন্ধে কোন খবর নাই সে ব্যক্তির মুরীদ হওয়া অনর্থক। সুতরাং তাহাকে পুনরায় কোন সিলসিলার মুর্শিদের নিকট মুরীদ হইতে হইবে। নিম্নে বর্ণিত ঘটনার দ্বারা এই কথার আরো প্রমাণ পাওয়া যায়ঃ যখন আমীরুল মু'মিনীন হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) খালেদ ইবনে

ওয়ালীদকে পদচ্যুত করিয়া আবূ উবায়দা ইবনে জার্‌রাহ্‌কে (রাঃ) আমীর এবং শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন তখন তিনি হযরত আবূ উবায়দাহকে একটি চিঠি লিখিয়া হযরত আমের ইবনে ওয়াক্কাস (রাঃ)-এর হাতে দিয়া দামেশ্‌কে পাঠাইলেন। বলিলেন, এই চিঠি খালেদকে দিবে এবং বলিবে, সমস্ত লোকদিগকে একত্রিত করিয়া হযরত আবূ বকরের মৃত্যুর সংবাদ দিতে এবং লোকদিগকে চিঠি পড়িয়া শুনাইবে ও চিঠির মর্ম অবগত করাইবে। অতঃপর শাদ্দাদ ইবনে আউসকে ডাকিলেন ও তাহার সঙ্গে মুসাফাহা করিয়া বলিলেন, তুমি আমেরের সঙ্গে শামে যাও এবং যখন আমের লোকদিগকে চিঠি পড়িয়া শুনাইবে তখন তুমি লোকদিগকে তোমার হাতে বায়আত হইবার জন্য আদেশ করিবে। তোমার হাতে বায়আত করার অর্থ আমার হাতে বায়আত করার শামিল।

এই অধম বলিতেছে, এই ঘটনায় ইহাই প্রমাণিত হইল যে, মুর্শিদের হাতের সঙ্গে মুরীদের হাত মিলান সংলগ্ন সিলসিলা স্থাপিত হয়। আর বায়আতের সময় একে অপরের হাতে হাত রাখা সুন্নাত। মুর্শিদ যাহাকে নিজের প্রতিনিধি বানাইয়া নিজের তরফ হইতে লোকদিগকে বায়আত করাইবার জন্য পাঠান তাহার হাতে বায়আত হওয়া দুরস্ত আছে এবং ইহা সুন্নাত। আর অসংলগ্ন হাল্‌কার অর্থ যাহার সিলসিলা হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছে নাই। আর যে সিলসিলা হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে তাহা বুঝিবার জন্য আমি তরীকায়ে নক্‌শবন্দিয়া মুজাদ্দেদিয়ার সিলসিলার বুযুর্গদের একটি তালিকা লিখিয়া দিতেছি, এইরূপে আমাদের অন্য তরীকার অবস্থাও বুঝিয়া নিবে ঃ

ফকীর কারামত আলী, হযরত সাইয়্যেদ আহমদ, হযরত মাওলানা শেখ আবদুল আযীয, হযরত শাহ ওলীউল্লাহ মোহাদ্দেছ দেহলভী (রহঃ), হযরত শেখ আবদুর রহীম, হযরত শেখ আবদুল্লাহ আকবরাবাদী, হযরত সাইয়্যেদ আদম বানূরী, হযরত শেখ আহমদ সিরহিন্দী মুজাদ্দেদে আলফেসানী, হযরত খাজা মোহাম্মাদ বাকীবিল্লাহ, হযরত খাজা আমকানকী, হযরত মাওলানা দরবেশ মুহাম্মাদ, হযরত মাওলানা যাহেদ, হযরত খাজা উবায়দুল্লাহ আহরার, হযরত মাওলানা ইয়াকূব চরখী, হযরত খাজা বাহাউদ্দীন নকশবন্দী, হযরত খাজা বাবা ছাম্মাছী, হযরত খাজা আলী

রামতেনী, হযরত খাজা মাহ্মূদুল খায়ের ফাগ্নূবী, হযরত খাজা আরেফ রেগওরী, হযরত খাজা খাজেগানে খাজা আবদুল খালেক আজদাওয়ানী, হযরত খাজা ইউসুফ হামদানী, হযরত খাজা আবূ আলী ফারমেদী, হযরত ইমাম আবুল কাসেম কোশাইরী, হযরত শেখ আবূ আলী দাকাক, হযরত শেখ আবুল কাসেম নাছিরাবাদী, হযরত শেখ আবূ বকর শিবলী, হযরত সাইয়্যেদুত্ তায়েফা জুনায়েদ বাগদাদী, হযরত শেখ আবুল হাসান ছিরীছফতী, হযরত শেখ মা'রূফ কারখী, হযরত ইমাম আলী রেজা, হযরত ইমাম মূসা কাযেম, হযরত ইমাম জাফর সাদেক রাঈসুল ফোকাহা ওয়াত্তাবেঈন, হযরত কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ, হযরত সালমান ফারেসী সাহাবায়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আমীরুল মু'মিনীন সাইয়্যেদুল মুসলিমীন আফযালুল খুলাফায়ে রাশেদীন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ), জনাবে সাইয়্যেদুল মুরসালীন ইমামুল-মুত্তাকীন হযরত আহমদ মুজতাবা মুহাম্মাদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওয়া আলাইহিম। এই সমস্ত বর্ণনার দ্বারা হাকীকতে মুহাম্মাদিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। ঐ হাকীকতের দ্বারা প্রত্যেক জায়গায় তাঁহার প্রকাশ হওয়ার জন্য اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ এবং اَللّٰهُ ইত্যাদি ইবারত শরীআতে উল্লেখ আছে। সুতরাং এই মুরাকাবা বুঝে আসার পর এইভাবে ডাকার মধ্যে কোন সন্দেহ নাই। আর ইহা হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য নির্দিষ্ট, অন্যকে এই ভাবে দূর হইতে ডাকা দুরস্ত হইবে না। কেননা অন্যের প্রত্যেক জায়গায় এইভাবে প্রকাশ হওয়া শরীআতের দ্বারা প্রমাণিত হয় নাই। ইহা ছাড়া আমরা হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এই ডাকার মধ্যে হুজূরের ওসীলা প্রার্থনা করিতেছি এবং আমাদের উদ্দেশ্য আল্লাহ্ তাআলার নিকট চাহিতেছি যেমন উল্লেখিত দুআর বিষয়বস্তুর মধ্যে প্রকাশ হইয়াছে। আর হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওসীলা চাওয়া হযরত আদম (আঃ) হইতে আজ পর্যন্ত রীতিমত প্রমাণ আছে, কোন মুসলমান এই ব্যাপারে কোন প্রকারের মতভেদ করে নাই। আর আসলে আল্লাহ্ সুবহানাহুর দরবারে হাজির হইয়া ঐ স্থানে হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পাইয়া তবে সেই দিকে মুখ করিয়া ডাক দিয়াছেন, যেমন এই

বিষয় উপরে বর্ণনা করা হইয়াছে। এই কথার ব্যাখ্যা جَذْبُ الْقُلُوْب কিতাবের পঞ্চদশ অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। উহার সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় বলা যায়- হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট ওসীলা ও শাফাআত চাওয়া এবং হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মর্যাদার ওসীলায় সাহায্য প্রার্থনা করা যেমন কিয়ামতের দিন হাশরের ময়দানে কোন নবী রাসূলদের কথা বলিবার ক্ষমতাও থাকিবে না। এমনকি শ্বাস ফেলিবারও ক্ষমতা থাকিবে না। তখন হযরত রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শাফাআতের দ্বার খুলিয়া দিবেন এবং আউওয়ালিন ও আখেরীনদিগকে নেআমতের সমুদ্রে ডুবাইয়া দিবেন এবং রহমতের নূরের দ্বারা পরিবেষ্টিত করিবেন। আর জনাব রেসালাতে মাআব হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হইতে এই চার জায়গায় সাহায্য প্রার্থনা করার উপর বিভিন্ন হাদীস ও আখবার বিদ্যমান আছে। পবিত্র ও মহান আল্লাহ্ তাআলার দরবারে উপস্থিত হইয়া সেখানে জনাবে রেসালাতকে পাইয়া যে সম্বোধন বাক্য ব্যবহার করে তাহার হাকীকত নামাযে হাজত এবং দুরূদ শরীফের ইবারত দ্বারা পরিষ্কার প্রকাশ পাইতেছে অর্থাৎ বান্দা আল্লাহ্ তাআলার হুজূরীর মুরাকাবা করিয়া বলিতেছে اَللّٰهُمَّ তখন তাঁহার হুজূরী হাসেল হইবে। আর ঐ জায়গায় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাকীকত পাইয়া বলিবে اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ وَاَتَوَجَّهُ اِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ অতঃপর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উপস্থিত পাইয়া নিজের দুঃখ-কষ্টের কথা বলিবে যেন হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁহার জন্য শাফাআত করে। তখন বলিবে يَا مُحَمَّدُ اِنِّىْ اَتَوَجَّهُ بِكَ اِلٰى رَبِّىْ فِىْ حَاجَتِىْ هٰذِهٖ لِتُقْضٰى لِىْ অতঃপর যখন তাঁহার একথা ইয়াকীন ও বিশ্বাস হইল যে, হযরত রহমাতুল্লিল আলামীন নিশ্চয়ই তাঁহার জন্য শাফাআত করিয়াছেন, তখন আল্লাহ্ তাআলার নিকট اَللّٰهُمَّ فَشَفِّعْهُ فِىَّ বলিবে।

এই বর্ণনার দ্বারা হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আকৃতি ও আভ্যন্তরীণ অর্থাৎ হাকীকতে মুহাম্মাদিয়া ও হাকীকতে আহমদিয়ার আস্থা

রক্ষা করিয়া তাঁহার মৌলিক উপাদানসম্ভূত আকৃতি এবং তাঁহার আভ্যন্তরীণ দিকে খেয়াল করিয়া হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জনাবে হাজির হইয়া দুরূদ পড়া খুবই সহজ বুঝা যাইবে ইনশা-আল্লাহ্। আর যাহারা হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অন্যান্য লোকের মত সমান মর্যাদাশীল মনে করে তাহাদের জন্য এইরূপ সম্বোধন করা শিরক বলা হইয়া থাকে, ইহা মূর্খতা বই কিছুই নয়; তাহাদের কাফের হইয়া যাওয়ারও ভয় আছে। আর জাগ্রত অবস্থায় কোন কোন ওলী আল্লাহ্দের হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যিয়ারত নসীব হইয়া থাকে। এই নেআমত হাসেল হইবার তরীকা উহাই যাহা বর্ণনা করা হইল। আর ইহার বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা দুষ্কর এবং ইহা আনন্দদায়ক ব্যাপার। সুতরাং এ ব্যাপারে আমার যতটুকু লেখার ক্ষমতা ছিল লিখিয়া দিয়াছি। এখন যদি কোন তালেব (অন্বেষণকারী) এই তরীকা জানিতে চায় তাহা হইলে আমি তাহাকে উত্তমরূপে শিক্ষা দিব ইনশা-আল্লাহ্। ইহার উপর আল্লাহ্র শত শত প্রশংসা করিতেছি।

দ্বিতীয় উপকার (ফায়েদা) ঃ হযরত মুহিউদ্দীন আবদুল কাদির জিলানী (রহঃ)- এর জাগ্রত অবস্থায় হুজূর রেসালাতে মা'আব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহিত যিয়ারত নসীব হওয়া সম্বন্ধে 'মাদারেজুন্ নুবুওয়াত' কিতাবে এইভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে শেখ জোনাইল শরীফ আবিল আব্বাস আহমদ ইবনে শাইখ আবদুল্লাহ্ আল যাহরী বলিয়াছেন- আমি একদিন শেখ মুহিউদ্দীন আবদুল কাদির জিলানী (রহঃ)-এর দরবারে উপস্থিত ছিলাম। তাঁহার দরবারে প্রায় দশ হাজার লোকের সমাগম ছিল। আর শেখ আলী ইবনে বাহতী, শেখের সম্মুখে নতজানু হইয়া বসিয়াছিলেন, এমতাবস্থায় তাঁহার তন্দ্রা আসিয়া গেল, তখন শেখ লোকদিগকে বলিলেন, তোমরা চুপ হইয়া যাও তখন সকল লোক চুপ হইয়া গেল। এমনকি তাহাদের শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ শুনা যাইতেছিল না। অতঃপর শেখ চেয়ার হইতে উঠিলেন এবং শেখ আলী বাহতীর সম্মুখে আদবের সহিত দাঁড়াইলেন এবং তাঁহার প্রতি খুব তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন। তারপর শেখ বাহতী জাগ্রত হইলেন। তখন শেখ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে

দেখিয়াছ? তিনি উত্তর দিলেন, হ্যাঁ দেখিয়াছি। শেখ বলিলেন, এই জন্য আমি আদবের সহিত তোমার সম্মুখে দাঁড়াইয়াছি। আরো বলিলেন, তোমাকে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি অসিয়ত করিলেন? তিনি বলিলেন, আপনার খেদমতে সর্বদা থাকিবার জন্য অসিয়ত করিয়াছেন। শেখ আলী লোকদের নিকট বর্ণনা করিয়াছেন, আমি স্বপ্নে যাহা দেখিয়াছি তাহা শেখ জাগ্রত অবস্থায়ই দেখিয়া থাকেন। আর বর্ণিত আছে, ঐ দিন ঐ মজলিসের সাতজন লোক এন্তেকাল করেন। আর 'মাওয়াহেবে লিদীনিহী' কিতাবের লেখক জাগ্রত অবস্থায় হযরত রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যিয়ারত নসীব হওয়া সম্বন্ধে মাশায়েখদের কাউল নকল করিয়া ইলেমের কায়দায় এবং আলেমদের কথাবার্তা ও প্রমাণ সাব্যস্ত করিয়াছেন এবং তিনি লিখিয়াছেন, ওলী আল্লাহ্দের জাগ্রত অবস্থায় হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যিয়ারত নসীব হওয়া সম্বন্ধে ক্রমাগত হাদীস দলীল দ্বারা প্রমাণ আছে এবং এমন মজবুত দলীল দ্বারা প্রমাণ আছে যাহার মধ্যে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। ঐ সময় আল্লাহ্র ওলীদের হুশ অদৃশ্য হইয়া যায় এবং চক্ষু-দৃষ্টি বন্ধ হইয়া যায়, এই অবস্থা হওয়ার দরুন তখন সে এই অবস্থাকে আয়ত্তে আনিতে পারে না।

সুতরাং হযরত শেখ আবদুল কাদির জিলানী (রহঃ) যে এতবড় মর্তবা হাসেল করিয়াছেন যাহার সম্বন্ধে আমি প্রথম ভাগে আলোচনা করিয়াছি- অর্থাৎ আল্লাহ্ পাকের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে বাহ্যিক সম্পর্ক রাখা সম্বন্ধে একটু পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি। তাহার প্রথম প্রকার অর্থাৎ আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিপূর্ণ অনুসরণ করিয়া ধীরস্থির থাকার মধ্যে তাঁহার পূর্ণ কামালিয়াত হাসেল হইয়াছিল। যেমন 'মাদারেজুন্ নুবুওয়াত' কিতাবে লেখা হইয়াছে- কুতবুল ওয়াক্ত শেখ আবদুল কাদির জিলানী (রহঃ) বলিয়াছেন, হুজূর পূর-নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যেখানে যেখানে কদম মুবারক রাখিয়াছেন আমিও ঠিক সেখানে আমার কদম স্থাপন করিয়াছি কিন্তু নুবুওয়াতের কদম যেখানে উঠাইয়াছেন সেখানে আমার কদম রাখি নাই, কেননা নুবুওয়াতের কদম নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে একমাত্র আল্লাহ্র

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য। সুতরাং হে তালেব (অন্বেষণকারী)! তাঁহার তরীকার মধ্যে শামিল হওয়ার জন্য অত্যধিক চেষ্টা কর এবং তাঁহার পায়রবীর সমুদ্রে ডুবিয়া যাও।

তৃতীয় উপকারঃ এখন যদি কেহ এইরূপ সন্দেহ পোষণ করে যে, আল্লাহ্ তাআলার হুজূরীর মুরাকারা করিবার সময় আল্লাহ্ ছাড়া দুনিয়ার অন্য সব কিছুর খেয়াল অন্তর হইতে দূরীভূত করিতে হইবে তবে হুজূর পূর-নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হুজূরীর খেয়াল কি করিয়া করিবে? এই সন্দেহের জওয়াব যাহা "মাদারেজুন্ নুবুওয়াতে" লেখা হইয়াছে জনাব জুনায়েদ (রহঃ) বলিয়াছেন, আল্লাহ্ তাআলার নিকট পৌছিবার সমস্ত রাস্তা বন্ধ কিন্তু মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রাস্তা এবং আল্লাহ্র দরবারে যাতায়াতের একটি মাত্র পথ আছে যাহা হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পথ। আর আল্লাহ্ তাআলার দরবারে যাতায়াতের কোন পথ নাই কিন্তু হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পিছনে পিছনে অনুসরণ করিয়া যাওয়া যাইতে পারে। তাহার ফলে তুমি প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে উভয় অবস্থাতে তাঁহার অনুসরণকারী বলিয়া গণ্য হইবে এবং আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ করিতে পারিবে।

এই অধম বলিতেছে যে, হযরত জুনায়েদ (রহঃ)-এর বর্ণনার দ্বারা এবং উপরের বিষয়বস্তু দ্বারা এই সন্দেহের নিরসন হইয়া গিয়াছে- অর্থাৎ আল্লাহ্ তাআলার হুজূরীর মাকামে পৌছিয়া তথায় আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পাইবে। এই প্রকারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মারেফাত হইতে আল্লাহ্ তাআলার মারেফাত হাসেল হইবে; সেই কথার বিস্তারিত ব্যাখ্যা আমি এখনই লিখিতেছি ইন্শা-আল্লাহ। আর উপরে দায়েরায়ে ওজূদিয়ায়ে মেছালিয়ার নক্শা লেখা হইয়াছে। সুতরাং ইহাতে পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে যে, যখন কোন বান্দাহ আল্লাহ্ তাআলার দিকে উচ্চাসনে বসিতে চাহিয়াছেন, প্রথমে তাহাকে মাকামে মাহ্মূদিয়াতে পৌছিয়া তৎপর আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্য লাভের স্থানে পৌছিতে হইবে। তখন সালেকের হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সূরত এবং হাকীকতের উপস্থিতির মুরাকাবা হাসেল হইবে এবং আল্লাহ তাআলার মারেফাত হাসেল হইবে। রাসূলুল্লাহর মারেফাতের অর্থ

আল্লাহ্ তাআলার মারেফাত হাসেল করা অর্থাৎ আল্লাহ্ তাআলার মারেফাতের স্বাদ গ্রহণ করা। সূফীদের পরিভাষায় কয়েকটি শব্দ নির্দিষ্ট আছে যাহা কোন কোন অবস্থার দিকে সঙ্কেত করে, ঐ শব্দগুলির মধ্যে ذوق، شرب এবং ردى ইহার বর্ণনা 'যাদুত তাকওয়া' কিতাবে দেখ। জওক (ذوق) এর অর্থ কোন বস্তুর স্বাদ গ্রহণ করা, আর শুর্‌ব (شرب) এর অর্থ পান করার মত কোন জিনিসের এক অংশ পাওয়া আর রদী (ردى)-এর অর্থ পানি পূর্ণ হওয়া অর্থাৎ পানি পান করিয়া পরিতৃপ্ত হওয়া। মোটকথা প্রথম অবস্থায় যে মারেফাত হাসেল হয় উহা জওক আর মধ্যম অবস্থায় মানুষের যে মারেফাত হাসেল হয় উহা শুর্‌ব আর শেষ অবস্থায় যে মারেফাত হাসেল হয় উহাকে রদী বলে অর্থাৎ যখন ঈমান আনিল তখন মারেফাতের স্বাদ গ্রহণ করিল এবং নিজের প্রতিপালন সৃষ্টিকর্তার দিকে তাহার খেয়াল দৌড়াইল আর যখন মারেফাতের এলেম হাসেল হইল আর আল্লাহ্ তাআলার তাওহীদ (একত্ববাদ) এবং তাহার সমস্ত সৃষ্টির কারখানার এবং রাসূলকে প্রেরণ ও তাঁহার সম্মান ইত্যাদি তাহার 'ইলমুল ইয়াকীন" হাসেল হইল, অর্থাৎ মারেফাতের এক অংশ তাহার হাসেল হইল। তখন তাহার শুর্‌ব হইল এবং পুরাপুরি মারেফাত হাসেল হইল।

চতুর্থ উপকারঃ 'মাদারেজুন্ নুবুওয়াত' কিতাবের মধ্যেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মারেফাতকে শুরব (شرب) বলা হইয়াছে, তাহার বর্ণনা লেখক কিতাবের সমাপ্তির মধ্যে দুইটি দিকের প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন। সুতরাং প্রথম ইঙ্গিতের মধ্যে বলিয়াছেন, যখন ওলীয়ে কামেলের আল্লাহ্ তাআলার মারেফাত অত্যধিক পরিমাণে হাসেল হয়, তখন সে ছালেকের দরজায় পৌঁছিয়া যায় এবং ধীরস্থির হইয়া যায়, তখন তাহার অস্থিরতা চলিয়া যায়। তখন তাহার মধ্যে আল্লাহ্ তাআলার যিকির ও স্মরণ মজবূত হইয়া থাকে। আল্লাহকে কখনও ভুলে না, তাহার কারণ, ওলীর মারেফাত হাসেল হয় তাঁহার যোগ্যতার উপযুক্ততা হিসেবে। সুতরাং যখন তাহার নিজের যোগ্যতা ও জ্ঞান হিসেবে আল্লাহ্ তাআলার মারেফাত হাসেল হয় তখন সে অবস্থায় তাহার স্থিরতা আসিয়া যায় তাহা কখনও টলে না। আর যখন ঐ ওলীর হযরত রাসূলুল্লাহ্‌র মারেফাত অত্যধিক পরিমাণে হয় তখন সে অস্থির হইয়া যায় এবং তাঁহার যিকির ও ইয়াদ

করিবার সময় তাহার মধ্যে অস্থিরতার চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়, কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মারেফাত তাহার জন্য শুরব (شـرب) হইয়া যায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যোগ্যতা ও মর্যাদা হিসাবে অর্থাৎ তাঁহার মর্তবা, যোগ্যতা এবং হাকীকত যেরূপ জানিতে পারিবে ঐরূপ আল্লাহ্‌র মারেফাত তাহার বৃদ্ধি হইবে। আর হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পদ-মর্যাদা ও হাকীকত জানা ঐ ওলীর আচার-আচরণ এবং চাল-চলন ও জ্ঞানের উপর নির্ভর করে। আর তাঁহাকে যতই জানিতে চেষ্টা করিবে আল্লাহ্ তাআলার মারেফাতও ততই বৃদ্ধি পাইবে। আর মারেফাতের শেষ সীমায় না পৌছিতে পারাকেই রদী বলা হয়, সুতরাং সে শুরব-এর মধ্যেই রহিয়া গেল এই জন্য তাহার ধীর-স্থির থাকার ক্ষমতা হয় না। আবার ধীরস্থির থাকার চিহ্ন তাহার মধ্যে প্রকাশ পাইতেও পারে যদি ওলীর মারেফাত নবীর প্রতি অত্যধিক পরিমাণে হয় এবং তখনই সে অন্যের চেয়ে বেশী মারেফাত হাসেল করে এবং আল্লাহ্ তাআলার দরবারে অধিক মর্যাদার অধিকারী হয় ও আল্লাহ্‌র মারেফাতে সকলের চেয়ে বেশী প্রবেশ লাভ করিতে পারিবে।

আল্লাহ্ ওয়ালাদের সংসর্গ এবং ওয়াজ ও তা'লীম মানুষের মধ্যে খুব প্রভাব বিস্তার করেঃ

মাদারেজুন্ নুবুওয়াতের দ্বিতীয় ইঙ্গিতে বলা হইতেছে যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিশেষ অভ্যাসের মধ্যে এই অভ্যাস ছিল যে, ওলী আল্লাহ্‌দের মধ্যে যে বক্তি তাঁহাকে আল্লাহ্‌র তাজাল্লির মধ্যে কোন তাজাল্লিতে দেখে (তাজাল্লির অর্থ প্রকাশ করিয়া দেওয়া) অর্থাৎ যখন আল্লাহ্ তাআলা তাঁহাকে স্বপ্নে, জাগ্রত অবস্থায়, নফীর অবস্থায় কিংবা হাকীকতে মুহাম্মাদীয়ার ধ্যান ও মুরাকাবার অবস্থায় প্রকাশ করিয়া দেয় তখন ওলী আল্লাহগণ তাঁহাকে দেখিতে পায়। তখন তাঁহাকে আল্লাহ্ তাআলা কামালিয়াতের যে পোশাক দিয়াছেন তাহা গুপ্ত রাখেন না বরং দর্শকদেরকে তন্মধ্য হইতে এক খেলাত (পোশাক) উপহার দেন যাহা দর্শকদের মধ্যে পাওয়া যায় এবং হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কামালিয়াত তাহার মধ্যে দেখা যায়। যেমন তাহাকে দেখিলে ও আলোচনা করিলে তাহাকে স্মরণে আসে। আর তাহার সাহচর্যে এবং তাহার ওয়াজ ও তা'লীমে মানুষের মধ্যে খুব প্রভাব বিস্তার করে। ইহার উপর ধারণা করিলে

অতঃপর যদি ঐ দর্শনকারী শক্তিশালী হয় এবং ঐ সময় ঐ পোশাক পরিবার যোগ্যতা থাকে, তবে ঐ সময় ঐ পোশাক পরিধান করিবে আর যদি যোগ্যতা না থাকে তবে খেলাত ঐ ভাবেই থাকিয়া যাইবে। যখন সে শক্তিশালী হইবে এবং দুনিয়ার মধ্যে ঐ খেলাত পরিবার যোগ্যতা হাসেল করিবে তখন সে দুনিয়ার মধ্যেই উহা পরিবে, তাহা না হইলে আখেরাতে পরিধান করিবে। সুতরাং যে ব্যক্তি দুনিয়া কিংবা আখেরাতের মধ্যে এই খেলাত পরিবে, তাহার প্রতি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তরফ হইতে যখন এই যোগ্যতা ও শক্তি মিলিবে তখনই সে ইহা পরিতে পারিবে। তারপর যে ব্যক্তি তাজাল্লির অবস্থায়, জাগ্রত অবস্থায় কিংবা শয়নে কিংবা নফীর মধ্যে অথবা হাকীকতে মুহাম্মাদীয়ার মুরাকাবার মধ্যে ঐ প্রথম ওলীকে খেলাত (পোশাক) পরিতে দেখিবে তখন ঐ প্রথম ওলী অন্য দর্শনকারীকে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তরফ হইতে ঐ খেলাত উপহার দিবেন। তখন ঐ প্রথম ওলীকে মাকামে মুহাম্মাদিয়ার ঐ পোশাক (খেলাত) উপহার দেওয়ার বদলে দ্বিতীয় খেলাত ঐ খেলাত হইতে অগ্রগতি হইবে। তারপর যদি ঐ দ্বিতীয় দর্শনকারী ওলী তৃতীয় ওলীকে দেখে তবে ঐ দ্বিতীয় ওলী তৃতীয় ওলীকে খেলাত (পোশাক) পরাইবে। তারপর এইরূপভাবে একে অন্যের নিকট হইতে খেলাত পুরস্কার পাইতে থাকিবে। আর এই খেলাত পুরস্কার দেওয়াই মুহাম্মাদীর হাল। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এই তরীকা সর্বদাই থাকিবে। এই তরীকা আরম্ভ হইয়াছে অনন্তকাল হইতে, যখন আল্লাহ্ তাআলা তাঁহার সম্বন্ধে সমস্ত আম্বিয়া (আঃ) হইতে ওয়াদা ও অঙ্গীকার নিয়াছিলেন। আর ঐ অঙ্গীকারের বর্ণনা কোরআন শরীফের তৃতীয় পারা সূরায়ে আলে-ইমরানের মধ্যে বর্ণনা করা হইয়াছে যথা-

وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيّٖنَ لَمَاۤ اٰتَيْتُكُمْ مِّنْ كِتٰبٍ وَّحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاۤءَكُمْ رَسُوْلٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ وَلَتَنْصُرُنَّهٗ قَالَ ءَاَقْرَرْتُمْ وَاَخَذْتُمْ عَلٰى ذٰلِكُمْ اِصْرِىْ قَالُوْۤا اَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوْا وَاَنَا مَعَكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِيْنَ -

অর্থাৎ "আর ঐ সময়কে স্মরণ কর যখন আল্লাহ্ তাআলা পয়গাম্বরগণের নিকট হইতে ওয়াদা এবং অঙ্গীকার লইয়াছিলেন যে, নিশ্চয়ই আমি কিতাব হইতে এবং হেকমত হইতে যাহা কিছু দান করিব। অতঃপর তোমাদের নিকট এক পয়গাম্বর আসিবে যিনি তোমাদের নিকট যে বস্তু (কিতাব) আছে উহাকে সত্য বলিয়া প্রমাণ করিবে। সুতরাং তোমরা তাঁহার প্রতি ঈমান আনয়ন কর এবং তাঁহাকে সাহায্য কর। আরও বলিলেন, তোমরা কি ইহার উপর আমার নিকট শক্ত ওয়াদা এবং অঙ্গীকার কর নাই? তাঁহারা বলিলেন, হ্যাঁ আমরা অঙ্গীকার করিয়াছি। অতঃপর (আল্লাহ্ তাআলা) বলিলেন, তোমরা সাক্ষী থাক এবং আমিও তোমাদের সাথে একজন সাক্ষী।" যখন সমস্ত আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম তাঁহাকে ঐ স্থানে দেখিলেন এবং অঙ্গীকার করিলেন তখন তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবুওয়াতের পোশাক পরিধান করিলেন। আউলিয়াগণ এই মর্যাদা হইতে কিছুটা দূরে ছিলেন। কেননা, আউলিয়াগণের দর্শন আম্বিয়াদের পরে এবং ঐ স্থানে নয়। কারণ ঐ জায়গা অতি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন। এই কারণেই আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামগণ সৌভাগ্যের এত অতি উচ্চমর্যাদা লাভ করিয়াছেন, যাহা অন্যের জন্য সম্ভব নয়। আম্বিয়াগণ প্রথম দর্শনকারী তাঁহারা হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অতি উচ্চ মর্যাদার পোশাকে শোভিত দেখিয়াছেন। যাহা একমাত্র তাঁহার জন্যই নির্দিষ্ট। আর এই খেলাত (উপহার) দেওয়া হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অভ্যাস ও নিয়ম ছিল যে, তাঁহার দর্শনকারী আউলিয়াগণ দুনিয়া প্রলয়কাল পর্যন্ত দিতেই থাকিবে।

নবীদের নিকট হইতে (আল্লাহ) যে ওয়াদা ও অঙ্গীকার নিয়াছিলেন আসমান, যমীন সৃষ্টির পর এবং আদম (আঃ)-এর জন্মের পূর্বে যাহা মেশকাতুল মাসাবীহ্ এবং তাহার শরাহ (ব্যাখ্যা) দ্বারা প্রকাশ পাইয়াছে। হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবুওয়াত পাইয়াছিলেন ইহার অনেক পূর্বে, যাহার বিস্তারিত বর্ণনা নিম্নে প্রদত্ত হইল। যখন আল্লাহ্ তাআলা নিজের তাজাল্লি (মাহাত্ম্য ও ঔজ্জ্বল্য) প্রকাশ করিলেন, তখন সমস্ত কিছুর রূহগুলি দেখা গেল অর্থাৎ ঐ সময় আসমান, সৃষ্টজীব, যমীন, আরশ, কুরসী, লওহ-কলম এবং সমস্ত ফেরেশতা ইত্যাদি সমস্ত কিছুই ছিল না, শুধু সমস্ত সৃষ্টজীবের রূহগুলি ছিল। সুতরাং সৃষ্টজীবের রূহগুলি দেখা গেল এবং সকলের প্রথমে আমাদের নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লামের রূহকে দেখা গেল। তখন ঐ রূহকে তাওহীদের শিক্ষা দিলেন এবং রূহ বলিয়া উঠিল لَآ اِلٰـهَ اِلَّا اللّٰهُ। তখন আল্লাহ্ তাআলা তাঁহাকে উচ্চ মর্যাদা দান করিবার জন্য বলিলেন, مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ঐ সময়ই তাঁহাকে রেসালাত (রাসূল মনোনীত) দেওয়া হইল لَآ اِلٰـهَ اِلَّا اللّٰهُ। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-সূর (বুলী) হইল এবং مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ আল্লাহ্ তাআলার সূর (বুলী) হইল, ঐ কালিমার নামই দ্বীন। তাই আঁ-হযরতের দ্বীন ও নুবুওয়াত আত্মার (রূহ) জগত হইতে হইয়াছে। সুতরাং সমস্ত নবী ও ওলী-দরবেশগণের জন্ম তাঁহার পরে হইয়াছে এবং সকলেই তাঁহার নায়েব (প্রতিনিধি)। মোটকথা প্রত্যেক নবীগণ ও আউলিয়াগণ নিজ নিজ সময়ে যে দ্বীন প্রচার করিয়াছেন ও করিবেন তাহা সমস্তই দ্বীনে-মুহাম্মাদী। তাঁহারই প্রতিনিধি হিসেবে সকলেই প্রচার করিয়াছেন ও করিবেন। ইহা তাফসীরে রূহুল বয়ানের মূলকথা যাহা مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ (মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্‌র) এর শানে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। ঐ বর্ণনার দ্বারা হাকীকতে মুহাম্মাদিয়া ও তাঁহার নুবুওয়াত এবং মর্যাদা মোটামুটিভাবে উম্মতদের বোধগম্য হইয়াছে। এখন তাঁহার পায়রবী (অনুসরণ) করার ইচ্ছা স্বেচ্ছায়ই আসিবে ইনশাআল্লাহ্। তাঁহার অনুসরণের কিতাব ফেকাহ্‌শাস্ত্র রহিয়াছে, যাহার বর্ণনা সম্মুখে আসিতেছে। তাঁহার পায়রবীর (অনুসরণের) তা'লীমের বিষয়বস্তু আমি কিছু ওয়াজের মধ্যে বর্ণনা করিব। এই বিষয়গুলি একটি হইতে অন্যটি পৃথক করিবার জন্য এবং স্মরণ রাখিবার জন্য এক এক বিষয়কে পৃথক পৃথকভাবে ওয়াজের মধ্যে লিখিব।

প্রথম ওয়াজ

এদেশের লোকদের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব আকীদাকে সংশোধন করার জন্য বিষয়বস্তু বর্ণনা করার মধ্যে এই ওয়াজের মধ্যে দুই প্রকারের উপকার আছে। এখন আমি ঐ বিষয়ে সংক্ষিপ্তভাবে ইঙ্গিত দিয়া বর্ণনা করিব। আলেমগণ এবং আমার খলিফারা এই বিষয়কে ব্যাখ্যা করিয়া বর্ণনা করিবেন। আর আমার রচিত حَقُّ الْيَقِيْنِ কিতাবের বিষয়বস্তুগুলি বর্ণনা করিলে অনেক উপকার হইবে। বিশেষ করিয়া নিম্নোক্ত হাদীসটি আমি সেখানে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করিয়া লিখিয়াছি-

يَكُوْنُ فِىْ اٰخِرِ الزَّمَانِ دَجَّالُوْنَ كَذَّابُوْنَ الخ

এই হাদীসটি আমি খুব ভালভাবে ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছি। এই হাদীস মেশকাতুল মাসাবীহের اَلْاِعْتِصَامُ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদে বর্ণনা করা হইয়াছে।

উলামা এবং খলীফাগণের প্রতি এই বিষয়গুলি বিস্তারিত ব্যাখ্যার নির্দেশ ঃ

হাম্মাদ ইবনে আবূ হানীফা (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি পিতাকে এই মাসআলা জিজ্ঞাসা করিলে জওয়াবে ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) উত্তর দিলেন, এমন ব্যক্তি যে নিজের লাভকে বুঝে অথচ নিজের লাভের নাম জানে না। যেমন- দুইটি পেয়ালা একটিতে মধু অন্যটিতে বিষ; এক ব্যক্তি উভয়টিরই নাম জানে না কিন্তু এতটুকু জানে যে মধু বিষ হইতে উত্তম, তবে তাহার এই না জানা তাহাকে ক্ষতিগ্রস্ত করিবে না। আর উপরোক্ত বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ইহা বলা যায় যে, যত কালিমা পাঠকারী লোক তাহারা নিজের শরীরটাকে মুসলমান তাহা বুঝে, তাহাদের মধ্যে কিছু লোক এমন আছে যাহারা কোন সময় উযূও করে নাই এবং নামাযও পড়ে নাই।

বে-নামাযীকে কাফের বলা এবং তাহাদের জানাযা না পড়া খারেজীদের মাযহাব ঃ

এই ধারণার বশবর্তী হইয়া অনেক লোক মুর্খতার অন্ধকারে নিমজ্জিত রহিয়াছে। কিন্তু ইহার পরও যদি কোন ব্যক্তি তাহাকে বলে যে, তুমি খ্রীষ্টান হইয়া যাও তাহা হইলে সে ব্যক্তি লড়াই করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া যাইবে। যে ব্যক্তি নিজের দ্বীনকে অন্যের দ্বীন (ধর্ম) হইতে ভাল মনে করিবে, সে ব্যক্তি মুসলমান; যদিও সে ফাসেকের মধ্যে গণ্য তবুও এইরূপ ফাসেক ও মুর্খ মুরদারকে দাফনও করিবে। যদি তাহাকে কোন ব্যক্তি মারিতেও চায় তবু সে নিজের মুরদারকে আগুনে পোড়াইতে দিবে না। এই মাসআলার উপর ধারণা করিয়া এইরূপ মূর্খলোক বিবাহ ও খতনা করাকে ছাড়িয়া দেয় না। তাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের নিকট তাহারা মুসলমান ভাই, তাহাদেরকে দেওয়ানা বা পাগল বলা হয়। কিন্তু এইরূপ লোকদিগকে ভালবাসা দিয়া এবং মিষ্টি কথা দিয়া বুঝাইতে হইবে এবং নামায পড়াইতে হইবে, কাফের বলা যাইবে না ও তাহাদের জানাযা পড়া

হইতে বিরত থাকা যাইবে না, যেমন খারেজীদের মায্হাব, শরহে আকায়েদে নসফী ও তাহার ভূমিকা ইত্যাদিতে তাহাদের মাযহাবের বিরোধিতা করা হইয়াছে এবং জওয়াবও দেওয়া হইয়াছে। যেই দেশে খারেজী সম্প্রদায় এবং ওহাবী সম্প্রদায় যারা 'লা মাযহাব' তাহাদের মাযহাবও ইহাই। আর ওহাবীরাও খারেজী সম্প্রদায় হইতে উদ্ভূত এবং ওহাবীদের নেতা আবদুল ওহাবও খারেজী সম্প্রদায় হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। যেমন "রদ্দুল মুহতার" কিতাবের বিদ্রোহী অধ্যায়ে তাহাদের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে। আর আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের নিকট 'আমল' ঈমানের মধ্যে শামিল নয়। আমল না করিলেও সে মু'মিন হইতে খারিজ হয় না কিন্তু তাহাদেরকে ফাসেক বলা যাইবে। রাফেজী এবং খারেজী জামাআতের নিকট 'আমল' ঈমানের মধ্যে শামিল। ঈমানের শর্তসমূহের মধ্যে অর্থাৎ 'একরার' (স্বীকারোক্তি), তাসদীক (বিশ্বাস) এবং 'আমল' (কার্যে পরিণত করা) এইগুলির মধ্যে পার্থক্য হইল ঈমানের শর্তসমূহকে মিল্লাত অর্থাৎ দ্বীন বলা হয়, আর আমলকে খেদমত বলা হয়। মিল্লাত খেদমত ছাড়া অর্থাৎ ঈমান আমল ছাড়া কিছুতেই ঠিক হইতে পারে না। আর খেদমত অর্থাৎ আমল ঈমান ছাড়া ও মিল্লাত ছাড়া কিছুতেই ঠিক হইতে পারে না। ঈমানের মধ্যে 'দাওয়াম' অর্থাৎ চিরস্থায়ী হওয়া শর্ত, আর আমলের মধ্যে দাওয়াম শর্ত নয়। তাহা হইলে আমাদের মাযহাব অনুযায়ী সমস্ত কালিমা পাঠকারী লোকদিগকে মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত বলা যাইবে। সুতরাং তাহারা মুসলমান। আর সমস্ত দুনিয়ার মুসলমান আমাদের দলভুক্ত, কাজেই আমাদের দল খুব বড়। আর খারেজী ও লা-মাযহাবীদের মতানুযায়ী খুব কম লোকই মুসলমান বলিয়া সাব্যস্ত হইবে। আর তাহাদের জামাআত ভাঙ্গিয়া যাইবে। কারণ তাহাদের আমলকে ঈমানের অন্তর্ভুক্ত করার দরুন খুবই মুশকিলে পড়িতে হইবে, নামায, রোযা ইত্যাদি আমল করা পর্যন্ত মুসলমান থাকিবে, আর আমল হইতে বিরত থাকিলে মুসলমান থাকিবে না। আর কোন কোন নাদান মূর্খ বলিয়া থাকে, ঈমানের শর্তসমূহ এবং কালিমায়ে শাহাদাতের অর্থ অনুসারে যতক্ষণ পর্যন্ত আরবী কায়দা মোতাবেক বর্ণনা না করিবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে মুসলমান হইবে না- ইহাত আরো কঠিন ব্যাপার। এই জামাআতের মতানুযায়ী শতকরা দশজনও মুসলমান পাওয়া দুরূহ ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইবে। আমরা কালিমার তাযীম ও আদবের দিকে লক্ষ্য করিয়া সমস্ত কালিমা পাঠকারী এবং মুসলমান

দাবীকারী লোকদিগকে মুসলমান বলি। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ফরমান অনুযায়ী এবং আমাদের বাপ-দাদা এবং স্বীয় বুযুর্গদের মুখে এই কথাই শুনিয়া আসিয়াছি যে, কালিমা পাঠকারীই মুসলমান। সুতরাং এই কথা শুনিয়া কেহ আবার এইরূপ ধারণা করিবে না যে, আমলের প্রয়োজন নাই (আল্লাহ্‌র নিকট এইরূপ করা হইতে আশ্রয় চাহিতেছি) এবং আমরা এই কথা বলিতেছি, যে ব্যক্তি কালিমা এবং দ্বীন ইসলামকে অস্বীকার করিবে সে কাফের এবং জাহান্নামে চিরকাল আযাব ভোগ করিবে। আর যে ব্যক্তি কালিমা পড়িয়া আমল করে না সে যেন হারাম কাজে লিপ্ত হইল; তওবা ব্যতীত মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তাহার স্থান জাহান্নামে হইবে এবং কমপক্ষে দুনিয়ার হিসেবে তাহার সাত হাজার বৎসর পর্যন্ত জাহান্নামে থাকিতে হইবে। আমরা ইহা হইতে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি।

ওয়াজকারীর (বক্তার) প্রতি এই স্থানকে খুব পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করার নির্দেশ ঃ

প্রথম উপকার ঃ এখন এই কথা শুনার পর কোন মুসলমানই আমল তরক করার সাহস পাইবে না এবং হারাম কাজও করিবে না। এখন ইহার বিস্তারিত ব্যাখ্যা হইতেছে- যে ব্যক্তি নামায ছাড়িয়া দিল এবং উহার কাযাও পড়িল না কিংবা নামাযের ফেদিয়াও আদায় করিল না কিংবা সুদ খাইল, ঢোল বাজাইল এবং মহর্‌রম উপলক্ষে তাজিয়া বাহির করিল এবং খাজা খিযিরের নামে ভেলা ভাসাইল ইত্যাদি হারাম কাজ করিল এবং তওবা ব্যতীত মৃত্যুমুখে পতিত হইল, তাহা ইহলে কমপক্ষে সাত হাজার বৎসর পর্যন্ত তাহাকে জাহান্নামের আগুনে জ্বলিতে হইবে। আর যে বে-নামাযী মুসলমান মারা গেল সে নিজের দুর্ভাগ্যের দরুন ফরযকে ছাড়িয়া দিল। এখন তাহার জানাযার নামায তাহার উপর ফরয নয় বরং সমস্ত মুসলমানদের উপর ফরয। তাহা হইলে তাহার উপর রাগ করিয়া মুসলমানগণ কি প্রকারে তাহার জানাযার নামায ছাড়িয়া দিবে। আর যদি তাহার জানাযার নামায ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে আঁ-হযরতের পায়রবী ছাড়িয়া দেওয়া হইল। কেননা কালিমার আদবের কারণে তাহার জানাযার নামায পড়া আঁ-হযরতেরই পায়রবী করা বুঝায়।

দ্বিতীয় উপকার ঃ আমাদের ধর্মে এই কথার প্রমাণ নাই যে, ফাসেক লোক ইসলাম ধর্ম হইতে একেবারে খারেজ এবং তাহাদের সঙ্গে খানা-পিনা

ও উঠা-বসা হইতে বিরত থাকিবে, বরং ইহা হিন্দুদের রীতি-নীতি। হ্যাঁ, ফাসেক কাজের এবং প্রকাশ্য হারাম কার্য যাহারা করে তাহাদিগকে তাকিদ এবং সংশোধন করার জন্য তাহাদের দাওয়াত গ্রহণ না করার জন্য হুকুম দেওয়া যাইতে পারে (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)। আর যে বাড়ীতে যেই দিন ঢোল বাজে এবং নাচ-গান, রং-তামাশা ইত্যাদি কাজ হয়, সেই দিন ঐ বাড়ীতে যাওয়া এবং খানাপিনা করা নিষেধ (হেদায়া, আলমগীরী ইত্যাদি ফতোয়ার কিতাব দ্রষ্টব্য)। আর ফাসেককে নিজের বাড়ীতে দাওয়াত-যিয়াফতে না ডাকা সম্বন্ধে عَيْنُ الْعِلْمِ (আইনুল ইলম) ইত্যাদি কিতাবেও প্রমাণ দ্রষ্টব্য। যাহা হউক এখন তাহাদের হইতে সম্বন্ধ ও সম্পর্ক ছাড়িয়া দেওয়া সম্বন্ধে এই তিন প্রকার তাকিদ শরীআতে সাব্যস্ত আছে, সম্ভবতঃ এই তাকিদের দ্বারা ফাসেক ব্যক্তি ভয় পাইয়া মুত্তাকী ও পরহেযগার হইতে পারে। আর শরীআতে যতটুকু ধমক দেওয়া এবং শাসন করা সম্বন্ধে তাকিদ দেওয়া হইয়াছে ততটুকুই করিবে। হিন্দুদের মত ছোঁত মানানোর কি দরকার। আর এমন ব্যবস্থা করিবে যাহার দ্বারা ফাসেক এবং বেদআতী লোক সৎ হইয়া তোমাদের দল হইতে বহিস্কার হওয়ার ভয়ে তোমাদের মুওয়াফেক হইয়া যাইবে। আর এইরূপ করিও না যে, তাহারা তোমাদের জামাআত হইতে বাহির হইয়া নিজেরা ভিন্ন করিয়া জামাআত স্থাপন করিবে। আর যদি তাহারা ভিন্ন করিয়া জামাআত স্থাপন করে তাহা হইলে এই তাকিদ কাহাদিগকে করিবে। এই স্থানে খুব তীক্ষ্ম বুদ্ধি এবং খুব হেকমত ও সহানুভূতির সহিত কাজ করাই উম্মতে-মুহাম্মাদীর জন্য বুদ্ধিমানের কাজ হইবে। এই জন্য আমি এই সমস্ত তদবীর বর্ণনা করিতেছি যাহাতে লোকেরা একটি সঙ্ঘবদ্ধ জামাআত হইতে পৃথক হইয়া না যায়। এইভাবে কাজ করিবে যাহাতে তাহাদের মন তোমাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। আর যদি এই রকমের ফাসেক ও বেদআতী লোকের বাড়ীতে ঐ দিন ছাড়া অন্য কোন দিন আমাদের দলের কোন লোক গিয়া পড়ে এবং তাহাদের ঘরের পানি পান করে ও উযূ করে কিংবা ঐ বাড়ীতে কিছু খানাও খায় তাহাতে আমাদের জাত যাইবে না। কারণ আমরা হিন্দু নই। অজ্ঞ এবং মূর্খ লোকেরা এই রকমের বাড়াবাড়ি করে যে বেদআতীদের কোন ছোঁয়া জিনিস খাইলে তাহাকে কু-জাত মনে করে। এর ফলে অবশেষে হিন্দু-মুসলমান যে রকম দুই পৃথক জাতিতে পরিণত হইয়াছে, আমরা নিজেরা সেইরূপ পৃথক দুই জাতিতে পরিণত হইব। ইহা বড়ই খারাপ কথা, এইরূপ হইতে দেওয়া কখনও উচিত নয়। বরং তাহাদেরকে এই কথা বল যে ভাই দ্বীনের (ধর্মের)

স্থান মক্কা-মদীনা, যদি সেখানকার নিয়ম পদ্ধতিতে না চল, তবে তোমরা কিরূপ মুসলমান? আর মক্কা মুয়াজ্জামার মধ্যে কা'বা শরীফ অবস্থিত, যদি তোমরা কা'বা শরীফ হইতে বিরত থাক, তবে দ্বিতীয় কা'বা কোথায় পাইবে? সুতরাং ইহাই মুসলমানিত্ব ও দ্বীন, মাযহাব যাহা মক্কা মুয়াজ্জামা ও মদীনা মুনাওয়ারার পথ, তাহা সানন্দে গ্রহণ কর। মক্কা মুয়াজ্জামার মধ্যে কা'বা শরীফ এবং মদীনা মুনাওয়ারার মধ্যে পয়গাম্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রওযা শরীফ অবস্থিত। যে কেহ তোমাদিগকে ঐ দুই পবিত্র স্থানের খেলাফ (বিপরীত) পথ দেখাইবে তাহারা তোমাদের দুশমন, তাহারা তোমাদের সঙ্গে কাবা শরীফের এবং হুজূরের রওযা শরীফের সম্পর্ক হইতে বিচ্যুত করিতে চায়। সুতরাং তোমরা 'লা মাযহাবী' এবং খারেজীদের কথা কখনও শুনিবে না। আর বেদআতী পীরদের কথা কখনও শুনিবে না, হাজার হাজার হাজীদের নিকট হইতে তোমরা ভালভাবে বুঝিয়া লও যাহা মাযহাব এবং পবিত্র ও মুবারক উভয় জায়গার পথ তাহাই গ্রহণ কর। আর মক্কা মুয়াজ্জামাকে কালামে পাকের মধ্যে সূরায়ে 'আত্তীন ওয়ায্যাইতুনের' মধ্যে শান্তিপূর্ণ শহর বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, সুতরাং সেখানকার লোকদের কথা মান্য কর এবং সমস্ত ঝগড়া-বিবাদের মীমাংসা তাহাদের দ্বারা করাইয়া লও।

যাহারা লোকদিগকে মারিয়া ধরিয়া জরিমানা আদায় করে নিঃসন্দেহে তাহারা দাজ্জাল :

তোমাদের আমাদের মধ্যে মিল মহব্বত হইয়া যাইবে, আর যাহারা অপরিচিত এবং যাহাদের অবস্থা জানা নাই, তাহারা কোন্ দেশের লোক ও কাহার খলিফা? যাহারা শহরে ও আলেমদের সম্মুখে যাতায়াত করে না এবং মূর্খ লোকদের নিকট গিয়া ওয়াজ-নসিহত করে এমন লোকদের কথা তোমরা কখনও শুনিবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আলেমগণ তাহাদেরকে গ্রহণযোগ্য না বলে এবং তাহাদের চাল-চলন দ্বীনের (ধর্মের) দেশ এবং শান্তিপূর্ণ শহরের চালচলনের সঙ্গে না মিলে, তাহা না হইলে তাহাকে দাজ্জাল বলা যাইবে। আমি জানিতে পারিয়াছি কোন কোন জায়গায় এই রকমের কিছু দাজ্জাল লোকের আগমন হইয়াছে। যেমন তাহারা লোকদিগকে মারপিট করিয়া জরিমানা আদায় করে। সুতরাং এই প্রকারের লোক নিঃসন্দেহে দাজ্জাল। কেননা শরীআতে মুহাম্মাদীর মধ্যে এইরূপ

কাজের কোন এখতিয়ার নাই। বরং বাদশাহ্ এবং হাকিমের আদেশ ব্যতীত কেহ কাহাকেও শাস্তি দিলে তবে বাদশাহ্র এবং হাকিমের উপর ঐ শাস্তিদাতাকে শাস্তি দেওয়া ওয়াজিব হইয়া যায় (ফতোয়ায়ে আলমগীরীর কিতাবুল হুদুদ-এর ষষ্ঠ অধ্যায়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। এমন দাজ্জালের নিকট যে ব্যক্তি মুরীদ হইয়াছে তাহার মুরীদী হইতে তওবা করিয়া ফিরিয়া আসা ওয়াজিব। আর যে ব্যক্তি মক্কা মুয়াজ্জামা ও মদীনা মুনাওয়ারাকে খারাপ বলে সে নিজেই খারাপ ও মিথ্যাবাদী। আর এই পবিত্র ও মুবারক দুই জায়াগার সাধারণ লোকের যেরূপ ঈমান, ইলম ও আমল আছে অন্য জায়গার বিশেষ বিশেষ লোকদেরও তেমন নাই। ইহা ধ্রুব সত্য এবং পরস্পর প্রমাণিত যে, ওহাবীদের প্রভূত্বের সময় মক্কাবাসীরা ওহাবীদের আনুকূল্যে কাজ করে নাই। ওহাবীরা তাহাদের খানা-পানি বন্ধ এবং অনেক কষ্ট-তাকলিফ দেওয়ার পরও তাহারা সব কিছু ধৈর্য ধরিয়া সহ্য করিয়া নিজের মাযহাবের উপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। আর বর্তমানে গোলাম-বাঁদী ক্রয়-বিক্রয় নিষেধ করিয়া রোম সুলতানের তরফ হইতে যে ফরমান নামা জারি করা হইয়াছিল তজ্জন্য মক্কাবাসীগণ সুলতানের হাকিম এবং সৈন্যদিগকে নিহত করিয়া নিজেরাও শহীদ হইলেন। তাহার পর যখন রোমের সুলতানের নিকট খবর পৌছিল, তখন রোমের বাদশাহ্ এই খবরকে আমার জানার বাহিরে বলিয়া প্রচার করেন। এবং মক্কাবাসীদিগকে শান্তির বাণী اَللّٰهُمَّ انْصُرْهُ وَانْصُرْ عَسَاكِرَهٗ শুনাইলেন। মোটকথা এই পবিত্র ও মুবারক দুই জায়গা হইতে দ্বীনে-মুহাম্মাদী প্রকাশ পাইয়াছে এবং এই পবিত্র জায়গাদ্বয়ে কিয়ামত পর্যন্ত দ্বীনে মুহাম্মাদী অবিচল ও অটল থাকিবার সংবাদ রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দিয়েছেন। মেশকাতুল মাসাবীহতে اَلْاِعْتِصَامُ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ এর অধ্যায়ে প্রথম পরিচ্ছেদে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হাদীস এবং দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে হযরত আমর ইবনে আউফ হইতে বর্ণিত হাদীস দ্রষ্টব্য।

আশ্চর্য কথা। বাংলাদেশে ধান-চাউল অনেক সস্তা থাকা সত্ত্বেও নীচ স্বভাবের লোকেরা ভাত খাওয়া বন্ধ হইয়া যাওয়াকে অত্যধিক ভয় করে। এমনকি কোন কোন জায়গায় বেদআতী দলের অনেক লোক পাঞ্জেগানা নামায পড়ে, জুমুআ এবং উভয় ঈদের নামাযও পড়ে কিন্তু ভাত বন্ধ হইয়া যাওয়ার ভয়ে ঢোল-বাজনা তা'যিয়া বাহির করা ইত্যাদি হারাম কাজে

বেদআতীদের সঙ্গে শরীক থাকে। কারণ তাহারা ভয় করে যে, তাহাদের রুটি রুযী বন্ধ হইয়া যাইবে এবং তাহাদিগকে কু-জাত বলিয়া আখ্যায়িত করা হইবে। সুতরাং এই ভয়ে হারাম এবং পাপের কাজে বেদআতীদের সঙ্গে শরীক থাকা এবং বেদআতীদিগকে সাহায্য করা ঈমানের দুর্বলতার পরিচয়। এক ব্যক্তি খাঁটি মুসলমান, সে যদি সৎ মাযহাবের উপর দৃঢ়স্থির থাকে এবং সত্য কথা বলে তাহা হইলে তাহাকে কেহ কু-জাত বলিবে না। সকলেই তাহাকে আদব-সম্মান করিবে এবং ধীরে ধীরে সকলেই তাহার কথার উপর আমল করিতে যত্নবান হইবে, সহীহ বোখারীতে বর্ণিত হইয়াছেঃ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, "হারাম এবং হালাল প্রকাশ্য দিবালোকের মত রহিয়াছে"- হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ উক্তি সম্পূর্ণ সত্য। দ্বীনে-মুহাম্মাদীর মধ্যে যাহা কিছু হালাল ও যাহা কিছু হারাম রহিয়াছে তাহা সমস্ত লোকেরা জানিতে পারিয়াছে। এখন তোমাদিগকেই আমি মুনসেফ নিযুক্ত করিতেছি, তোমরা তোমাদের এই উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে সত্য করিয়া বল, যখন হইতে দ্বীনদার লোকেরা তাযিয়া বহন করা, ঢোল বাজান ইত্যাদি হইতে লোকদের নিষেধ করিয়াছেন তখন হইতে বিমার এবং জিনিসের দুর্মূল্য ও অভাব-অনটন আরম্ভ হইয়াছে। সুতরাং জিজ্ঞাসা করিতেছি তাযিয়া বহন করা শিরক বেদআত এবং ঢোল বাজান ইত্যাদি খারাপ কাজ হইতে বিরত থাকিতে আমরাই নিষেধ করিতেছি না অন্য কাহারো মুখ হইতে এই কথা শুনিয়াছ? যদি এই কথা বল যে, আমরা কখনও শুনি নাই, তাহা হইলে শত শত লোকেরা তোমাদিগকে মিথ্যাবাদী বলিবে। এমনকি হিন্দু লোকেরা পর্যন্ত তোমাদিগকে মিথ্যাবাদী বলিবে। আর নামায না পড়া, রোযা না রাখা, যাকাত না দেওয়া, সুদ খাওয়া, নেশার বস্তু পান করা ইত্যাদি হারাম কাজ হইতে নিষেধ করিবার জন্য আল্লাহ্ তাআলা রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রেরণ করিয়াছেন, সুতরাং রাসূলের সাহায্য করা তোমাদের অবশ্য কর্তব্য। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হারাম কাজ হইতে নিষেধ করার পরও যদি তোমরা সে কাজ কর তাহা হইলে তোমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধাচরণ করিলে। এখন তোমরাই বিচার কর যাহারা রাসূলের সাহায্য করে তাহারা রাসূলের জামাআত হইতে বাহির হইয়া যায়? না ঐ ব্যক্তি রাসূলের জামাআত হইতে বাহির হইয়া যায় যে রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে। তারপরও যদি ঐ সমস্ত লোকেরা এই কথা বলে যে, আমাদের বাপ-দাদা সব সময় ঢোল বাজান

ইত্যাদি কাজ করিত তাহা হইলে তাহাদেরকে বল চুপ থাক এবং বিরুদ্ধাচরণকারীদের অন্তর্গত হইও না যাহাতে তোমরা মুসলমানদের মধ্যে মুখ দেখানোর যোগ্য থাকিতে পার।

তৃতীয়তঃ এই কথা তাহাদিগকে বল যে, প্রত্যেক লোকেরই নিজের ধর্ম প্রিয়বস্তু। হিন্দু- যাহারা বেদ্বীন, তাহারাও যখন তাহাদের ধর্ম চলিয়া যায় এমন কাজ হইতে দেখে তাহা হইলে তখন তাহারা কেমন ভাবে ঐ কাজ হইতে বাঁচিয়া থাকে। যেন মুসলমানদের ছোঁয়া কোন জিনিস তাহারা খায় না। অথচ এই কথার কোন ভিত্তি নাই। তাহাদের নিকট আল্লাহ্‌র কোন কিতাবও নাই। আমাদের মুসলমানদের কাজের ভিত্তি আছে এবং আমাদের নিকট আল্লাহ্‌র কিতাবও মওজূদ আছে। কাজেই যদি আমরা ভিত্তিপূর্ণ কথা এবং আল্লাহ্‌র কিতাবকে মান্য না করি তাহা হইলে আমরা হিন্দুদের চেয়েও নিকৃষ্ট ও বোকা।

চতুর্থতঃ এই কথা বল তোমরা যেরূপ এক বিঘা কিংবা দুই বিঘা জমির মোকদ্দমা করার জন্য নিজের কাজ কর্ম ফেলিয়া জিলা শহরে যাও সেইরূপ নিজের দ্বীনের ব্যাপারেও পবিত্র কোরআন শরীফ সঙ্গে নিয়া আমাদের নিকট আস। কোরআন শরীফ ও দ্বীনের সমস্ত কিতাব দেখিয়া আলেমগণ যেই ভাবে চলিতে বলিবেন সেই ভাবেই চলিবে। এই প্রকারে তাহাদিগকে দোষারোপ করিয়া বল যখন তোমরা নিজের রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করিবে তখন আমরা তোমাদের জামাআতে আসিব না ও খানাও খাইব না। আর অন্যদিন তোমাদের হালাল খানা খাইব ও তোমাদের ঘরেও আসিব এবং তোমাদিগকে দ্বীনে-মুহাম্মাদীর কথা শুনাইব। আর যে কালিমা পাঠকারী কালিমার আদব রক্ষা করিয়া মারা যাইবে তাহার জানাযায় এবং দাফন কাফনে শরীক হইব। এতদসত্ত্বেও যদি কোন পথভ্রষ্ট তোমাকে জাতের বাহির করে তাহা হইলে তুমি একা থাক এবং দ্বীনের উপর ধীরস্থির থাক। এবং সর্বদাই এইকথা বলিতে থাক, আমি রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ না করার কারণে, যাহারা রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে তাহারা আমাকে তাহাদের জাত হইতে বাহির করিয়া দিয়াছে। যদি সে মানুষ হয় তবে লজ্জিত হইয়া তোমার সঙ্গে শরীক হইবে। আর যদি সে আদমের সন্তান হইয়া গুনাহ্‌র কাজের উপর হটধর্মী করিলে তবে সে শয়তানের পদাঙ্কানুসরণ করিল এবং শয়তানের চালচলন গ্রহণ করিল। আর সকলেরই এই কথা জানা আছে, আদমের রীতি হইল গুনাহ্ হইতে তওবা করা এবং কান্নাকাটি করা। আর

শয়তানের নিয়ম হইল নিজের গুনাহ্র উপর হটধর্মী করা কাজেই আমাদের চিন্তা করা দরকার। আমরা আদমের সন্তান না শয়তানের সন্তান। সুতরাং যাহার সন্তান তাহার অনুসরণ করাই কর্তব্য।

দ্বিতীয় ওয়াজ

প্রথমতঃ যতক্ষণ পর্যন্ত প্রত্যেক মু'মিন ব্যক্তি নিজের যাবতীয় কাজ-কর্ম শরীআতে মুহাম্মাদীর মতে না করিবে এবং হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিজের মীমাংসাকারী ও বিচারক মনে না করিবে এবং তিনি শরীআতের যাবতীয় মোকাদ্দমা ও কায়কারবারের যে ফয়সালা করিয়াছেন তাহা সন্তুষ্টচিত্তে মানিয়া না লইবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে মু'মিন হইতে পারিবে না।

দ্বিতীয়ত ঃ যতক্ষণ পর্যন্ত মু'মিন হইতে পারিবে না। প্রকাশ্যভাবে দুইটি বিষয়ই দেখা যায় সেই জন্য আমি দুইটির কথাই বলিলাম। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উভয়ই এক বিষয়। এই ওয়াজের দশটি উপকার (ফায়দা) যাহা নিম্নে বর্ণনা করা হইল।

প্রথম উপকারঃ প্রথম কথার বর্ণনায় এই দলিল পেশ করিতেছি, মনোযোগ দিয়া শোন। আল্লাহ্ পাক কুরআনে মাজীদে ইরশাদ ফরমাইয়াছেন ঃ

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا -

(সূরায়ে নিসা ঃ ৫ পারা)

অর্থাৎ- "অনন্তর আপনার প্রতিপালকের শপথ ইহারা মু'মিন হইবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তাহাদের পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া সংঘটিত হইলে ইহাকে তাহারা আপনার দ্বারা মীমাংসা না করাইবে, অনন্তর আপনার এই মীমাংসায় নিজেদের অন্তরে সঙ্কীর্ণতাবোধ করিবে না এবং পুরাপুরিভাবে গ্রহণ করিয়া লইবে।" এই আয়াতে সাব্যস্ত হইয়াছে যে নিজেদের প্রত্যেক কাজ কর্মে ও মুআমালায় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বিচারক হিসেবে মানিয়া নিবে। তিনি যে মীমাংসা করিবেন তাহাতে জয় হউক কিংবা পরাজয় হউক সন্তুষ্টচিত্তে মানিয়া লইবে এবং অসন্তুষ্টি প্রকাশ

করিবে না। আর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মীমাংসাকারী (বিচারক) গ্রহণ করা এবং প্রত্যেক কাজের ফয়সালা তাহার শরীআত মোতাবেক করা ইত্যাদি বিষয় তাঁহার শরীআতের কিতাবে সুস্পষ্টভাবে বিদ্যমান আছে, অন্য কাহারো নিকট যাওয়ার আবশ্যক নাই। তাহার দ্বীন ও শরীআত কিয়ামত পর্যন্ত কোন রদ-বদল হইবে না। আর কোন বিচারকের নিজের বুদ্ধিতে কাজ করিবার এবং কাহারো পক্ষপাতিত্ব করিবার ও তাহার হুকুমকে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিবার ক্ষমতা নাই। কিয়ামত পর্যন্ত সমস্ত বিরোধের মীমাংসা তাহার শরীআতের মধ্যে রহিয়াছে। যদিও কোন কোন ক্ষেত্রে নূতন নূতন বিষয় আসিয়া পড়ে। ইহাও হযরতের মু'জিযা যে, কিয়ামত পর্যন্ত তাহার শরীআত ও হুকুম বাকী থাকিবে। যদি কোন ব্যক্তি হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যতীত অন্য কাহারো নিকট নিজেদের মুআমালা (মোকাদ্দমা) নিয়া যায় কিংবা অন্য জাতির কিতাব অনুসারে নিজেদের মোকাদ্দমার ফয়সালা হওয়ার উপর সন্তুষ্ট থাকে তবে সে মু'মিন নয়। যদি কোন ব্যক্তি নিজের মোকাদ্দমা শরীআত মোতাবেক মীমাংসা করাইতে চায় কিন্তু বিবাদী অন্য কাহারো দ্বারা মীমাংসা করাইতে চায় এবং ঐ হাকিমের আদেশ মানিতে তাহাকে বাধ্য করিতে না পারে এবং শরীআত মোতাবেক মীমাংসা করাইতে তাহার দুঃখ-কষ্ট হয় তবে নিঃসন্দেহে সে মু'মিনের মধ্যে পরিগণিত হইবে। যেমন আল্লাহ্ তাআলা কোরআনে মাজীদে ইরশাদ করিয়াছেন–

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا (সূরায়ে বাকারাঃ ৩য় পারা)

অর্থাৎ- "আল্লাহ্ কোন ব্যক্তিকে তাহার ক্ষমতার বাহিরে কষ্ট দেয় না।"

এখন মুসলমানদের কর্তব্য আমি এই কিতাবের প্রথম বিষয় বস্তুর প্রথম নসিহতের দ্বিতীয় ফায়দায় আল্লাহ্ তাআলার হাজির নাজির থাকার মুরাকাবা সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছি ঐ মুরাকাবায় বসিয়া তুমি অন্তরকে জিজ্ঞাসা কর পবিত্র আল্লাহ্ তাআলাকে এই কথা বলিতে পার কি না যে, তোমার শরীআত মোতাবেক আমরা মীমাংসা করিব না, দেখ তোমার অন্তর কি বলে। এই প্রকারে তুমি মনে মনে ধারণা কর জাগ্রত অবস্থায় হউক কিংবা নিদ্রিত অবস্থায় হউক, যদি আল্লাহ্ তাআলা আমাকে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যিয়ারত নসীব করে। তাহা হইলে হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এই কথা বলিতে পারিবে কি না- এতটুকু ধারণাই যথেষ্ট।

দ্বিতীয় উপকারঃ শরীআতের ইলমের কিতাব ফেকাহ্ শাস্ত্র আর আকায়েদ, তাসাউফ এবং তাফসীর যাহা ফেকাহ্ শাস্ত্রের অনূকূলে তাহা ফেকাহ্র মধ্যেই শামিল। সর্বপ্রথম ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) শরীআতের লেখা আরম্ভ করেন এবং 'তাহারাত' (পবিত্রতা) হইতে আরম্ভ করিয়া 'মীরাছের' (উত্তরাধিকার) মধ্যে সমাপ্ত করিয়াছেন। তাঁহার লেখার পর যাহারা ইলমে শরীআতের উপর কিতাব লিখিয়াছেন (অর্থাৎ ফেকাহ্ শাস্ত্র) সকলেই তাহার অনুকরণ করিয়া 'তাহারাত' হইতে শুরু করিয়া মীরাছের বর্ণনা পর্যন্ত সমাপ্ত করিয়াছেন, এবং 'তাঁহার পদ্ধতি অনুসারে সকলেই অধ্যায় অধ্যায় করিয়া লিখিয়াছেন, এমনকি মু'তাযিলা এবং শিয়া ইত্যাদি সম্প্রদায়ের লোকেরাও ঐ রকমই লিখিয়াছেন কিন্তু ভ্রষ্টতার দরুন ঐ সম্প্রদায়ের লোকেরা ঐ অধ্যায়গুলির মাসআলার মধ্যে মতভেদ করিয়াছেন। কিন্তু শরীআতের ইলমের আসল পদ্ধতির মতভেদ করা কাহারো পক্ষে সম্ভব নয়। ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) রেওয়ায়েত করিয়াছেন এবং ইলমে শরীআত শিক্ষা করিয়াছেন তাবেঈনদের নিকট হইতে, তাবেঈনগণ রেওয়ায়েত করিয়াছেন ও ইলমে শরীআত শিক্ষা করিয়াছেন সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) হইতে, সাহাবায়ে-কেরাম নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হইতে এবং নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিবরাঈল (আঃ) হইতে এবং জিবরাঈল (আঃ) সর্বশক্তিমান এক আল্লাহ্র নিকট হইতে। অর্থাৎ এই জগতে এবং আত্মার জগতে হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রূহ সমস্ত ফেরেশতাদের রূহকে তালীম দিয়াছিল। আর যে উস্তাদের নিকট হইতে ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, ইমাম বুখারী এবং ইমাম মুসলিম (রহঃ) রেওয়ায়েত করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর ছাত্র ছিলেন। এখানে দেখা যায় এই সমস্ত মর্যাদাশীল ইমামগণও ইমাম আবূ হানীফার ছাত্র ছিলেন। তাহার ব্যাখ্যা মুসনাদ, খাওয়ারেযমী এবং নাসিমুল হারামাইন কিতাবে দ্রষ্টব্য। কাজেই যে সমস্ত মিথ্যাবাদীরা বলে যে, ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) মুহাদ্দিস ছিলেন না কিংবা ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর পরে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাহারা সম্পূর্ণ মিথ্যাবাদী।

দ্বিতীয় উপকার দ্বিতীয় কথার বর্ণনার উপর ঃ দ্বীনের মূল এবং শাখা প্রশাখার উপর বিশ্বাস রাখার বর্ণনা আকায়েদের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য

পুস্তক কিতাবে-তামহীদ যাহা আবূ শুকর সালেমী (রহঃ) প্রণীত, সেই কিতাবের নবম অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদের মধ্যে বলা হইয়াছে- দ্বীনের মূল এবং শাখা-প্রশাখা কি? যে সমস্ত শরীআতের হুকুম আহ্কাম আল্লাহ্ তাআলার তরফ হইতে ফরয (অত্যাবশ্যক) করা হইয়াছে তাহা মুখে স্বীকার করা এবং সত্য বলিয়া বিশ্বাস করা ঈমানের শর্ত এবং ইহাই দ্বীনের মূল কথা। আর দ্বীনের শাখা প্রশাখা সম্বন্ধে উল্লেখিত কিতাবের সপ্তম অধ্যায়ের চতুর্থ পরিচ্ছেদে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের নিকট ইহাও ঈমানের শর্ত যাহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করা ওয়াজিব, তাহা ব্যতীত ঈমান সহীহ ও শুদ্ধ হইবে না এবং তাহাকে অস্বীকার করিলে কাফের হইবে। তাহার বিস্তারিত ব্যাখ্যা হইল- যে সমস্ত বিষয় সম্বন্ধে ফরয হওয়া এবং সত্য হওয়া সম্বন্ধে কোরআনের আয়াত দ্বারা প্রমাণ হইয়াছে কিংবা খবরে মুতাওয়াতের (পরম্পরায়) কিংবা সমস্ত উম্মতের সম্মতি দ্বারা সাব্যস্ত হইয়াছে ঐ সমস্ত বিষয় ফরয এবং হক হওয়া স্বীকার করা ও বিশ্বাস করা ওয়াজিব। আর যাহা কিছু খবরে-ওয়াহেদ (হাদীসের সিলসিলা) দ্বারা সাব্যস্ত হইয়াছে এবং সমস্ত উম্মত উহা করার উপর সম্মতি জ্ঞান করে নাই সেই সমস্ত বিষয় স্বীকার করা ঈমান সহীহ হওয়ার জন্য শর্ত নয়। আর যাহা কিছু খবরে-ওয়াহেদ দ্বারা সাব্যস্ত হইয়াছে এবং সমস্ত ফোকাহাগণ (ফেকাহ শাস্ত্রবিদ) উহা সহীহ হওয়ার উপর সম্মতি প্রকাশ করিয়াছেন এবং উহা স্বীকার করার উপর সমস্ত উম্মতগণ ব্যাখ্যা ছাড়াই সম্মতি প্রকাশ করিয়াছেন সেই সমস্ত বিষয় স্বীকার করা ঈমানের শর্তের মধ্যে শামিল। যেমন- কবরের আযাব, পুলসিরাত, মীযান, শাফাআত, মে'রাজের মধ্যে আসমান যমীনে ভ্রমণ ঐ অবস্থার মধ্যে গণ্য যাহা খবরে ওয়াহেদ দ্বারা সাব্যস্ত হইয়াছে। কিন্তু ফোকাহাগণ এবং সাহাবায়ে-কেরাম (রাঃ) উহা সহীহ হওয়ার উপর একমত। আর উহাকে স্বীকার করা এজতেমা ছাড়াও হইয়া গিয়াছে। তবে এইরূপ বিষয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা ওয়াজিব। এখন যে ব্যক্তি এই উভয় প্রকারের মধ্যে যাহা খবরে-ওয়াহেদ দ্বারা সাব্যস্ত হইয়াছে উহা যদি অস্বীকার করে তবে সে কাফের হইবে, না হইবে না? কোন্ কোন আলেম বলিয়াছেন, কাফের হইবে, কেহ কেহ বলিয়াছেন হইবে না। কারণ সে এখানে ব্যাখ্যা করিয়াছে। অতঃপর অস্বীকার করিয়াছে অর্থাৎ উক্ত হুকুম পরিষ্কার আয়াত দ্বারা সাব্যস্ত না হওয়ায় ইহার ভিন্ন ব্যাখ্যা করা এবং অন্য অর্থ করার

সুযোগ রহিয়াছে। সুতরাং সে অন্য অর্থ করিয়াছে এবং উহা ফরয না হওয়া সম্বন্ধে বলিতেছে, সেহেতু এই ব্যাপারে তাহাকে বেদআতী বলা যাইবে এবং তাহাকে ফাসেক হুকুম দেওয়া যাইবে। কিন্তু শরীআতের হুকুম আহকাম পালন করা ঈমানের শর্ত বলিয়া জানা ওয়াজিব নয়। শর্ত না জানিয়া আদায় করিলেও ঈমান দুরস্ত হইবে। আর আহলে সুন্নাত ওয়াল-জামাআতের নিকট শর্ত ঐ আহকাম-আরকানকে বলা হয় যাহার উপর আমল করা ফরয যেমন- নামায, রোযা, যাকাত ইত্যাদি, শরীআতের হুকুমগুলি ফরয জানা ঈমানের শর্ত, উহার উপর আমল করা ঈমানের শর্ত নয়, অর্থাৎ উহার ফরযের এতেকাদ রাখা এবং উহা ফরয বলিয়া স্বীকার করা ঈমানের শর্ত। যদি তুমি উহা ফরয হওয়ার এতেকাদ রাখিয়া উহা না কর তবে তুমি ফাসেক এবং বেদআতী।

অতঃপর ঐ নবম অধ্যায়ের বিষয়বস্তু আলোচনার পর বলিতেছে- যে সমস্ত বিষয়ের প্রতি এতেকাদ (বিশ্বাস) রাখা ওয়াজিব এবং যে সমস্ত জিনিস আল্লাহ্ তাআলার মনমত এবং পছন্দনীয় অর্থাৎ যে সমস্ত জিনিসকে আল্লাহ্ তাআলা পছন্দ করেন ও ভালবাসেন এবং তাহার প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন ঐ সমস্ত জিনিসের সৌন্দর্য পছন্দনীয় এবং ভাল হওয়ার প্রতি অন্তরে বিশ্বাস রাখিবে এবং ঐ সমস্তকে কবূল করিয়া নিবে, এমনকি যদি বান্দা অন্তরে বিশ্বাস করে কিংবা স্মরণ করে অর্থাৎ মুখে এমন কথা উচ্চারণ করে যাহা আল্লাহ্ তাআলার দ্বীনের বিপরীত এবং আল্লাহ্ তাআলার ভালবাসার ও সন্তুষ্টির বিপরীত তাহা হইলে ঐ বান্দা কাফের হইয়া যাইবে। এইরূপভাবে এমন জিনিসের ইশারা করিল অথচ মুখে বলিল না। যেমন- যখন কাহারো নিকট এইভাবে বলা হয় যে, আল্লাহ্ তাআলা ওমুককে ভালবাসেন কিংবা ইহা বলে যে, ওমুককে এইভাবে ভালবাসেন, তখন যদি ঐ ব্যক্তি ইহা শুনিয়া বলে যে, আমি তাঁহাকে ভালবাসি না তবে এই ব্যক্তি কাফের হইয়া যাইবে। আর এইভাবে নিজের মাথা দিয়া কিংবা হাত দিয়া, দাড়ি দিয়া ইশারা করে কিংবা অন্য কোন জিনিস দিয়া এই কথাকে ফিরাইবার জন্য কিংবা ঠাট্টা করার জন্য কিংবা বিরুদ্ধাচরণ করার জন্য ইশারা করে তবে সে কাফের হইয়া যাইবে। এইভাবে আল্লাহ্ তাআলার ক্রোধের বিষয়ের মধ্যে যাহাকে আল্লাহ্ তাআলা দুশমন মনে করে এবং উহার উপর অসন্তুষ্ট, যদি কেহ বলে আমি উহাকে দুশমন মনে করি না এবং উহার উপর অসন্তুষ্টও না তবু ঐ ব্যক্তি কাফের হইয়া যাইবে। এইরূপভাবে রাসূলুল্লাহ্

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সন্তুষ্টির বিষয় এবং ক্রোধের বিষয়ের উপরও এতেকাদ রাখিতে হইবে এবং তাঁহার আনুকূল্যে থাকা ওয়াজিব। যেমন আল্লাহ্ তাআলার পছন্দনীয় ও ক্রোধের কাজের মধ্যে। যদি আল্লাহ্র বিরুদ্ধাচরণ করে এবং বিশ্বাসও করে কিংবা তাহা রোধ করার চেষ্টা করে এবং উহাকে হালকা ও হেয় প্রতিপন্ন করার ইচ্ছা করে, তবে ঐ ব্যক্তি কাফের হইয়া যাইবে। সুতরাং এতেকাদ (বিশ্বাস) এবং দ্বীনের দিকে লক্ষ্য করিয়া আল্লাহ্ তাআলার প্রিয় বস্তু এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রিয় বস্তুকে ভালবাসা ওয়াজিব। আর এমন জিনিস যাহা তবিয়তে খারাপ লাগে এবং পছন্দনীয় নয় কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা ও তাঁহার রাসূল সেই জিনিসকে ভালবাসেন ও পছন্দ করেন, তাহা হইলে উহাকে ভালবাসিবে। যেমন কাহারো কয়েকজন স্ত্রী আছে, তাহার সম্বন্ধে কিতাবে بَابُ الْقَسْمِ (বাবুল কসমে) আলোচনা করা হইয়াছে- স্বামী তাহার স্ত্রীদিগের খানা-পিনা, বস্ত্র এবং রাত্রে স্ত্রীর ঘরে থাকা ও তাহার সঙ্গে শয়ন করার ব্যাপারে ইনসাফ করিবে। উল্লেখিত বিষয়ে সকলের হক সমানভাবে আদায় করিবে। আর এই ইনসাফ স্বভাবগত মহব্বতের বেলায় ফরয নয়। কেননা ইহা মানুষের ক্ষমতার বাহিরে। এই মাসআলার বিস্তারিত ব্যাখ্যা হেদায়া, শরহে বেকায়া, জামেউর্‌রুমুজ, রদ্দুল মুহতার, কুদূরী এবং কানজ কিতাবগুলি দ্রষ্টব্য। সুতরাং এই প্রকারের ইনসাফ করা কিংবা অন্ধকার রাত্রে মসজিদে যাওয়া তবিয়তে পছন্দ হয় না কিন্তু আল্লাহ্ তাআলার পছন্দ। এই জন্য ইহাকে ভালবাসিবে এবং মানিয়া নিবে ও পছন্দ করিবে। এই প্রকারে তাহাজ্জুদের নামাযের জন্য কিংবা ফজরের জন্য সময়মত জাগরিত হওয়া তবিয়তে পছন্দ করে নাকি। রাগান্বিত হওয়া তবিয়তে চায়না কিংবা গরমের দিনে রোযা রাখা কিংবা খুব কঠিন শীতের দিনে স্বাস্থ্য ভাল থাকা সত্ত্বেও এবং পানি ব্যবহারের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও কোন কোন লোক স্বভাবগত কারণে গোসল করিতে চায় না। কিন্তু এই সমস্ত কাজ আল্লাহ্ তাআলা পছন্দ করেন না কাজেই তোমারও অপছন্দ করিতে হইবে।

উপরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁহার আনীত সমস্ত খবরকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করা ঈমানের শর্ত বলা হইয়াছে অর্থাৎ রাসূলের প্রত্যেকটি কথা ও কাজকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিবে, নিজের বুদ্ধিকে সেখানে খাটাইবে না, আকল উহা গ্রহণ করুক বা না করুক,

তোমার উহা গ্রহণ করিতে হইবে এবং উহা অন্তর হইতে গ্রহণ করিতে হইবে। যেমন মে'রাজের খবর- আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মে'রাজের রাত্রে আল্লাহ্ তাআলার কুদরতের অনেক আশ্চর্য জিনিস দেখিয়াছেন এবং উহার বর্ণনা দিয়াছেন আসলে উহা সম্পূর্ণ সত্য। এখন কেহ যদি এ কথা মনে করে যে, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উহার বর্ণনায় বাড়াবাড়ি করিয়াছেন তাহা হইলে সে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিল না, সুতরাং সে মু'মিন নয়। কেননা বাড়াবাড়ির অর্থ- কোন জিনিস আসলে যাহা উহা হইতে অনেক বাড়াইয়া বর্ণনা করা এবং তাহা মিথ্যা, আর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিথ্যা হইতে সম্পূর্ণ পবিত্র। সুতরাং নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মে'রাজের রাত্রে আল্লাহ্ তাআলার যে সমস্ত বড় বড় সৃষ্ট জিনিস দেখিয়াছেন এবং উহার খবর দিয়াছেন যেমন- বলিয়াছেন, আমি এক পরদা হইতে অন্য পরদা ভ্রমণ করিয়াছি এইভাবে ৭০ হাজার পরদা অতিক্রম করিয়াছি এবং প্রত্যেক পরদার দূরত্ব পাঁচশত বৎসর। তারপর এক সমুদ্রের কিনারে একজন ফেরেশতা দেখিলাম সে এত বড় যে, একটি চড়ুই পাখি যদি একশত বৎসর উড়ে তবুও তাঁহার এক স্কন্ধ হইতে অন্য স্কন্ধে পৌছাইতে পারিবে না। তারপর লাল রঙের এক নূরের সমুদ্রের তীরে উপস্থিত হইলাম। উহার কিনারায় একজন ফেরেশতা দেখিলাম, সে এত বড় যে, আল্লাহ্ তাআলা যদি তাহাকে আসমান ও যমীন গিলিয়া ফেলিবার আদেশ দেয় তাহা সে পারিবে। আর ইস্রাফীল (আঃ)-কে দেখিলাম, তিনি নিজের বাজু দ্বারা পূর্ব হইতে পশ্চিম পর্যন্ত বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার দুই পা সপ্তম যমীনের শেষ পর্যন্ত পৌছিয়াছে। আর যখন আরশকে দেখিলাম, পূর্বে যাহা কিছু দেখিয়াছি সবই ছোট বলিয়া মনে হইল। আল্লাহ্ তাআলা আরশকে আট শত ষাট পায়া বিশিষ্ট সৃষ্টি করিয়াছেন এবং প্রত্যেক পায়া পৃথিবীর সমান মোটা। আর এক পায়া হইতে অন্য পায়ার দূরত্ব হইল- একটি চড়ুই পাখি আশি হাজার বৎসর দ্রুত গতিতে উড়িয়া যাইতে যতক্ষণ সময় লাগে। আর আরশের মধ্যে একশত হাজার বাতি আছে, প্রত্যেক বাতি আসমান যমীন তুল্য। আল্লাহ্ তাআলা আরশকে সবুজ রঙের জাওহার দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছেন উহা এমন চমকদার যে, নিজের চেহারা দেখা যায় এবং বেশ বড় দেখা যায়। তাহাকে একটি সাপ চতুর্দিকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে উহার মাথা সাদা এবং উহার দুইটি চক্ষু যরদ ইয়াকুত দ্বারা সৃষ্টি

এবং উহার দাঁত যামরদ (মূল্যবান পাথর) দ্বারা সৃষ্টি এবং উহার শরীর লাল স্বর্ণের বর্ণ এবং উহার উচ্চতা ষাট লক্ষ বৎসরের রাস্তা। উহার সত্তর হাজার বাজু আছে, প্রত্যেক বাজুর মধ্যে সত্তর হাজার পালক আছে; প্রত্যেক পালকের মধ্যে আবার সত্তর হাজার ছোট পালক আছে, প্রত্যেক ছোট পালকের মধ্যে সত্তর হাজার মুখ আছে এবং প্রত্যেকের মুখ হইতে তাসবীহ বাহির হইতেছে বৃষ্টির ফোটার মত- এই অবস্থায় যখন আরশকে দেখিলাম, তখন বলিলাম হে আল্লাহ্! তুমি ইহা কি জন্য সৃষ্টি করিয়াছ? উত্তর হইল, তুমি তোমার শ্রেষ্ঠতা ভুলিয়া আমার শ্রেষ্ঠত্বের দিকে লক্ষ্য কর। **নাযহাতুল মাজালিস** কিতাবে পরিষ্কারভাবে এই রকম সংক্ষিপ্তাকারে লিখিয়াছেন ('নাযহাতুল মাজালিস' দ্রষ্টব্য)। তারপর এই সমস্ত সৃষ্ট বস্তুর খবর সত্য বলিয়া স্বীকার করার পর তাওহীদ এবং আল্লাহ্ তাআলার আযমত (শ্রেষ্ঠত্ব) খুলিয়া যায়। এই স্থানে ঈমানের প্রশ্ন, চাই আকল উহা গ্রহণ করুক বা না করুক তাহার কোন কথা নাই বরং যে কথা গবেষণা, ইজতেহাদ এবং আকলের ধারণা দ্বারা অনুমান করা যায় না ঐ স্থানে রেওয়ায়েত গ্রহণযোগ্য (আশআতুল্ লুমআত' মেশকাত শরীফের শরাহ্র ভূমিকা দ্রষ্টব্য)।

মোটকথা সত্যবাদী সংবাদদাতার সংবাদকে সত্য বলিয়া জানা ও স্বীকার করা ফরয, ইহা ব্যতীত মু'মিন হইতে পারিবে না। এই সমস্ত কথা যদি জ্ঞানে না ধরে, তবে জ্ঞানের অপরাধ। যেমন কোন পিপড়ার নিকট যদি সমস্ত পৃথিবীর পাহাড়ের বিরাটত্ব বর্ণনা করা হয় আর পিপড়ার পায়ের হিসাব করিয়া যদি বলা হয়, ওমুক পাহাড় এত বৎসরের রাস্তা তবে পিপড়ার আশ্চর্যবোধ হইবে। তাহা হইলে ইহা পিপড়ার বুঝের দোষ কেননা পাহাড় আসলে নিজের জায়গায় দাঁড়ান আছে। আসলে আল্লাহ্ তাআলার ঐ সমস্ত বড় বড় সৃষ্টির হিসাবে আমরা পিপড়ার চেয়েও ছোট। কিন্তু ঈমানের বরকতে এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খবর দেওয়ার প্রভাবে ঐ সমস্ত আশ্চর্য আশ্চর্য জিনিসগুলিকে যেন আমরা নিজ চক্ষে দেখিতেছি বলিয়া মনে হয়। وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى ذٰلِكَ এই বর্ণনার দ্বারা কেহ যেন আকলকে হেয় মনে না করে, আকলের মর্যাদা অনেক বড়। আমার তৃতীয় ওয়াজের তৃতীয় উপকারের মধ্যে ইহা জানিতে পারিবে ইনশাআল্লাহ্।

এখানে আকলের মন্দতা বর্ণনা করা হয় নাই বরং এই প্রকারের কার্যাবলী সম্বন্ধে জানার ক্ষমতা আল্লাহ্ তাআলা আকলকে দেন নাই।

যেমন আল্লাহ্ তাআলার নিজের পাক জাত সম্বন্ধে অবগত হওয়া জ্ঞানের বাহিরে। এই বিষয়কে বুঝার জন্য আরেকটি বিষয় মনে রাখা দরকার, তাহা হইল মানুষের মধ্যে আল্লাহ্ তাআলা পাঁচটি প্রকাশ্য ইন্দ্রিয় দিয়াছেন ঃ (১) দৃষ্টি শক্তি (২) শ্রবণ শক্তি, (৩) ঘ্রাণ শক্তি, (৪) স্বাদ গ্রহণ করার শক্তি এবং (৫) স্পর্শ শক্তি অর্থাৎ ঠাণ্ডা-গরম কঠিন-নরম ইত্যাদি বুঝার ক্ষমতা।

সুতরাং এই পাঁচ প্রকারের ইন্দ্রিয়ের নির্দিষ্ট এবং ভিন্ন ভিন্ন অনুভূতি আছে যাহা ঐ ইন্দ্রিয়ই বুঝে। ইহার নির্দিষ্ট অনুভূতি ছাড়া অন্য ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি সে বুঝে না যেমন দেখার জিনিস চক্ষু বুঝতে পারে কিন্তু কান বুঝতে পারে না। যদি তুমি এক ইন্দ্রিয় দ্বারা অন্য ইন্দ্রিয়ের কাজ লইতে চাও তবে ঐ ইন্দ্রিয় কিছুই বুঝিতে পারিবে না বরং নিজের অনুভূতি ব্যতীত অন্যের অনুভূতিকে সে শুধু না বলিয়াই মনে করিবে যেমন চক্ষুকে যদি শ্রবণ করার জিনিস সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হয় তাহা হইলে সে রং ও আকৃতি ছাড়া শব্দ নাই বলিয়াই মনে করিবে।

এইরূপ ভাবে আল্লাহ্ তাআলা আকলকে ক্ষণস্থায়ী নূতন জিনিস হিসেবে ক্ষণস্থায়ী বস্তুকে বুঝার জন্যই সৃষ্টি করিয়াছেন। যখন সে কাদিম অর্থাৎ চিরস্থায়ী বস্তুর জানার ইচ্ছা করে তখন উহা প্রকাশ হইয়া পড়ে ('নাযহাতুল-মাজালিস' কিতাব দ্রষ্টব্য)। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ ফরমাইয়াছেন, আল্লাহ্ তাআলা যেরূপ আসমানের লোক হইতে পরদার মধ্যে আছেন সেইরূপ যমীনের লোকদের হইতে এইরূপভাবে আকলের বাহিরে, যেইরূপ চক্ষের অন্তরালে। নিশ্চয় আল্লাহ কোন বস্তুর ভিতরেও প্রবেশ করেন না আবার কোন বস্তু হইতে অদৃশ্যও না, আর নিশ্চয় مَلَأْ اَعْلٰى অর্থাৎ উপরের লোক ও দল আল্লাহ্ তাআলাকে যেইরূপভাবে খোঁজে তোমরাও আল্লাহ্ তাআলাকে সেইরূপভাবে অন্বেষণ কর।

এই কথা ভালরূপে মনে রাখিলে অনেক জায়গায় কাজে আসিবে, যেমন তাকদীর (ভাগ্য) এবং আল্লাহ্ তাআলার দর্শনলাভ (দীদার) এবং চতুষ্টয় মাযহাব হক (সত্য) হওয়া এবং এই চার মাযহাবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা এবং এই চার মাযহাবের মধ্যে এক মাযহাবকে গ্রহণ করা ওয়াজিব। আর এই চার মাযহাবের অনুপাতে আমল করা। যেমন- যে সময় যে মাযহাবের আমল করা মনে চায় সেই মাযহাবেরই আমল করা, ইহা বাতেল। সুতরাং এই সমস্ত মাসআলার ব্যাপারে আকলের দ্বারা কাজ নিলে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

এই সমস্ত মাসআলার হাকীকত প্রত্যেক লোকের জানা নাই। এই সমস্ত মাসআলাকে সত্য বলিয়া জানা আর হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খবরকে সত্য বলিয়া স্বীকার করা একই কথা, কেননা এই সকল মাসআলার মধ্যে সমস্ত উম্মতের একমত। আর আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, আমার উম্মতগণ ভ্রষ্টতার উপর একমত হইতে পারে না। সমস্ত ইসলামী রাষ্ট্রের আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের সাধারণ ও বিশেষ বিশেষ লোক এবং মক্কা শরীফ ও মদীনা শরীফের সাধারণ ও বিশেষ বিশেষ লোকেরা এই সমস্ত মাসআলার মধ্যে একমত। যদি কোন ব্যক্তি ইলমের কথা বাদ দিয়া এই সমস্ত বিষয়ের মধ্যে সন্দেহ পোষণ করে তবে সে নিরেট মুর্খ বই কিছুই নয় এবং শয়তানের শৃঙ্খলে আবদ্ধ।

তৃতীয় উপকার ঃ এখন প্রত্যেক কাজকর্ম শরীআত মোতাবেক করার জন্য এবং তাহার অবস্থা বুঝে আসার জন্য আমি এই স্থানে ঐ সমস্ত মাসআলার আলোচনা করিতেছি, যাহা এই সময় জানিয়া রাখা প্রত্যেকের জন্য বিশেষ প্রয়োজন। ইহা না জানিলে ও উহার উপর আমল না করিলে ফাসাদ সৃষ্টি হয়। সুতরাং আমি প্রত্যেক মাসআলার হুকুমের অবস্থা শরীআতের কিতাব অনুসারে লিখিয়া দিতেছি। উহা সন্তুষ্টচিত্তে মানিয়া নেওয়া উল্লেখিত আয়াতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার নিদর্শন। ঐ সমস্ত জরুরী মাসআলার মধ্যে প্রথম মাসআলা হইল- শরীআতের আদেশানুযায়ী প্রত্যেক স্বামীর উপর ফরয হইল স্ত্রীর মোহর ব্যতীত তাহাকে বসবাস করিবার জন্য একটি ঘর দিবে, স্ত্রী নিজের ইচ্ছামত ইহা ব্যবহার করিবে এবং নিজের ক্ষমতা অনুসারে তাহার খাওয়া-পরা ও খাদেমের ব্যবস্থা করিবে অর্থাৎ ধনী তাহার অনুপাতে এবং দরিদ্র তাহার ক্ষমতা অনুপাতে। এইভাবে ধনী স্ত্রীর খরচাদি দেওয়ার ব্যাপারে কৃপণতা করিবে না। আর দরিদ্র নিজের ক্ষমতার বাহিরে খরচ দেওয়ার জন্য হারাম মাল দ্বারা স্ত্রীর ভরণ-পোষণ করিবে না। আর স্ত্রী তাহার দরিদ্র স্বামীর ক্ষমতার বাইরে খরচ দেওয়ার জন্য তাকিদ করিবে না। আর যে স্বামীর তিন কিংবা চারজন স্ত্রী আছে সে ভরণ-পোষণ এবং পালাক্রমে রাত্রিযাপনের মধ্যে ন্যায় বিচার করিবে অর্থাৎ সকলের হক সমানভাবে আদায় করিবে। যদি ন্যায় বিচার না করে তবে নিম্ন বর্ণিত হাদীস অনুপাতে শাস্তির উপযুক্ত হইবে। যেমন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন, যে স্বামীর দুইজন

স্ত্রী সে যদি উভয়ের মধ্যে ন্যায় বিচার না করে তাহা হইলে কিয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তির সমস্ত শরীরের অর্ধেক টুকরা হইয়া পড়িয়া থাকিবে। আল্লাহ্ তাআলা এই রকম অপমানিত আযাব হইতে সকল মুসলমানকে হেফাযত করুক (নাযহাতুল মাজালিস দ্রষ্টব্য) নাশেযাহ স্ত্রীর ভরণ-পোষণ স্বামীর উপর জরুরী না (হেদায়া দ্রষ্টব্য)। নাশেযাহ ঐ স্ত্রীলোককে বলে, যে স্ত্রী নিজের স্বামীর অনুমতি ব্যতীত অন্য লোকের ঘরে থাকে।

চতুর্থ উপকার ঃ স্ত্রীর উপর ফরয (অবশ্য কর্তব্য)- সাধারণতঃ সব সময় স্বামীর তাবেদারী করা, চাই স্বামী ধনী হউক, গরীব হউক, স্বাস্থ্যবান হউক, কিংবা অসুস্থ হউক অন্ধ হউক কিংবা বধির হউক কিশোর হউক কিংবা বৃদ্ধ বা যুবক হউক প্রত্যেক কাজে ও কথায় স্বামীর আদেশ মানিয়া চলিবে এবং তাহার তাবেদারী করিবে কিন্তু আল্লাহ্ তাআলার আদেশের খেলাপ কোন হুকুম করিলে তাহা মানিবে না। খেদমতের দ্বারা স্বামীকে সন্তুষ্ট রাখিবে। যদি স্বামী একরাত্র কোন কারণবশতঃ স্ত্রীর উপর অসন্তুষ্ট থাকে তবে তাহার নামায উর্ধে উঠিবে না অর্থাৎ কবূল হওয়ার জায়গায় পৌছিবে না। স্বামী যাহাকে স্ত্রীর ঘরে আসিতে নিষেধ করে তাহাকে কখনও নিজের ঘরে জায়গা দিবে না। আর যে বাড়ীতে যাইতে ও থাকিতে স্বামী নিষেধ করে সেই বাড়ীতে কখনও যাইবে না এবং থাকিবেও না। স্বামী আদেশ করুক কিংবা নিষেধ করুক কখনও কোন স্ত্রীলোক কোন গায়রে মাহরাম (যাহার সঙ্গে বিবাহ হারাম নয়) পুরুষের নিকট নির্জনে বসিবে না, যদিও তাহা কোরআন শরীফ, ইলমে ফেকাহ্ শিক্ষা করিবার জন্য হয় কিংবা যিকির এবং মুরাকাবা শিক্ষার জন্য হয়। যদিও এই কথা স্বীকার করিয়া লওয়া হয় যে, উভয়ের মধ্যে কোন খারাপ কাজ হইবে না তবুও একা নির্জন ঘরে বসা স্বাভাবিকভাবে খারাপ। এ বিষয় নিম্নোক্ত হাদীসের দ্বারা জ্ঞাত হইবে ইনশাআল্লাহ।

গায়রে মাহরাম পুরুষের ঘরে যতক্ষণ পর্যন্ত তাহার সঙ্গে কোন মাহরাম পুরুষ না থাকিবে ততক্ষণ পর্যন্ত কখনও বসিবে না। আর যে জায়গায় যাইতে রাস্তায় রাত্র হইয়া যায় এমন জায়গায় গায়রে মাহরামের সঙ্গে যাইবে না। ইহা عام সাধারণ হুকুম; তাহা বিবাহ শাদী কিংবা হজ্বের সফর কিংবা অন্য কোন প্রকার সফর হউক। আর স্বামীর তাবেদারী করার জন্য শরীআতে এই শর্ত নাই যে, মোহর, থাকার জায়গা এবং ভরণ-পোষণ ছাড়া যখন স্বামী, স্ত্রীকে কোন বস্তু দিয়া দিল কিংবা অমুক কাজ করিল

কিংবা নিজের মাল হইতে কিছু অংশ স্ত্রীকে লিখিয়া দিল কিংবা তাহাকে ছাড়া দ্বিতীয় স্ত্রীকে কিছুই দিল না কিংবা দ্বিতীয় স্ত্রীকে তালাক দিয়া দিল তবে ঐ স্ত্রী স্বামীর তাবেদারী করিবে কারণ স্বামীর তাবেদারী করা স্ত্রীর উপর স্বাভাবিকভাবে ফরয (অবশ্য কর্তব্য)। যতক্ষণ পর্যন্ত স্বামী স্ত্রীকে আল্লাহ্ তাআলার নাফরমানী করার হুকুম না দেয়। এই সমস্ত কথার দলিল কোরআন শরীফের সূরায়ে নিসা, সূরায়ে বাকারাহ এবং সূরায়ে তালাকে বিদ্যমান। আর হাদীসের কিতাব এবং ফেকাহ্র কিতাবে كِتَابُ النِّكَاحِ كِتَابُ الْكَرَامَةِ এবং بَابُ الْحَجِّ এর মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বিদ্যমান। আমি এখানে একত্র করিয়া দিয়াছি। স্ত্রী-নিজের স্বামীর খুশীতে খুশী আর তাহার দুঃখে দুঃখিত হইবে। আর পর্দা করার মাসআলা যেভাবে ফেকার কিতাবে লেখা হইয়াছে এবং আমি যেভাবে تَزْكِيَةُ النِّسْوَانِ কিতাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছি সেই প্রকারে স্ত্রীলোকেরা ঐ স্ত্রীলোককে এই মাসআলা আমল করাইবে। স্বামী নিজের স্ত্রীকে গালি দিবে না এবং তাহাকে অভিশাপ দিবে না। আর বাকী অন্যান্য মাসআলার তাহকীক এবং তাফসীল শরীআতের অন্য কিতাবে দেখিয়া নিবে।

পঞ্চম উপকার ঃ নামাযের তাকিদ এবং তাছির-এর বর্ণনা ঃ এখন যেহেতু স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মতৈক্য ও মিল-মহব্বত না হওয়ার দরুন এবং স্ত্রী অবাধ্য হওয়ার দরুন হাজার প্রকার ফাসাদের সৃষ্টি হইতেছে। স্বামীর জন্য পৃথিবী জাহান্নাম স্বরূপ এবং স্ত্রীর জন্যও দ্বীন দুনিয়া খারাপ হইতেছে এবং সেও জাহান্নামী হইতেছে। আর যে উপযোগিতার জন্য শরীআতের মধ্যে বিবাহের প্রচলন করা হইয়াছে ঐ সমস্ত উপযোগিতা নষ্ট হইয়া যাইতেছে। উভয়ে পাপের মধ্যে লিপ্ত হইতেছে। আর এই যামানায় বিশেষ করিয়া বাংলাদেশে স্ত্রীলোকেরা অবাধ্য হওয়ার দরুন এই সমস্ত দুর্ঘটনা ঘটিতেছে। উহার বর্ণনা করাও খারাপ মনে হয়। আর ঐ সমস্ত খারাবির প্রভাব সকল জায়গায়ই আসিয়া পড়িবে। এই জন্য আমি এই মাসআলাকে সর্বপ্রথম লিখিলাম। এই সময় এই দেশে এমন কোন হাকিম নাই যে, স্বামী-স্ত্রীকে শরীআতের বিধান অনুসারে জোরপূর্বক চালাইবে। এই জন্য আমি উভয়ের হিতাকাঙ্ক্ষী হিসেবে শরীআতের কিতাব হইতে বাছিয়া দুইটি তদবীর লিখিতেছি। উহার আসল কথা এই যে, আমি এই দুঃসময়ে এই মুশকিলের আসানের তদবীর অন্বেষণ করিবার জন্য

শরীআতের দিকে প্রত্যাবর্তন করিলাম। আর মু'মিনদিগকে ফিসক ও গর্হিত কাজ হইতে বাঁচাইবার জন্য ওয়াজ এবং হেকমতের কথা ছাড়া আর কিছু গ্রহণ করি নাই। সুতরাং এই সময়ের দিকে লক্ষ্য করিয়া আমি এই দুইটি তদবীরই পাইয়াছি। সঠিক পথ প্রদর্শনকারী রাব্বুল আলামীনের অনুগ্রহে দৃঢ় আশা রহিল, যে ব্যক্তি এই তদবীর অনুপাতে আমল করিবে তাহার সমস্ত খারাপ দূরীভূত হইয়া যাইবে। ইন্‌শাআল্লাহ।

ষষ্ঠ উপকার ঃ প্রথম তদবীরের বর্ণনা ঃ স্বামী-স্ত্রী উভয়ই নামাযের মধ্যে দৃঢ়স্থিত হইবে অর্থাৎ দুনিয়ার শত কাজ থাকিলেও কখনও নামাযকে ছাড়িবে না। তাহা হইলে আল্লাহ্ চাহেত নামাযের বরকত এবং প্রভাবে সমস্ত ফাসাদ আপনা-আপনিই চলিয়া যাইবে। কেননা পাপ নফসের ফাসাদ হইতে সৃষ্টি হয়। আর নফসের রোগের চিকিৎসা শরীআতের হুকুম পালন করিলেই হইয়া যায়। বিশেষ করিয়া নামাযের দ্বারা নফসের রোগের চিকিৎসা ভালরূপেই হয়। যেমন قَوْلُ الْاَمِيْن কিতাবে তাফসীরে রূহুল বয়ান হইতে লিখিয়াছি। 'নাযহাতুল মাজালিস' কিতাবেও অনুরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে। আর কোরআন মাজীদে আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন,

اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاۤءِ وَالْمُنْكَرِ

অর্থাৎ- "নিশ্চয় নামায মানুষকে নির্লজ্জ ও খারাপ কাজ হইতে বিরত রাখে।" হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়িত এবং যত খারাপ কাজ আছে সবই করিত। লোকেরা এই সংবাদ নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জানাইলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করিলেন, নিশ্চয়ই নামায তাহাকে একদিন এই কাজ হইতে বিরত রাখিবে। অতঃপর বেশী দিন অতিবাহিত হয় নাই সে তওবা করিয়া সম্পূর্ণ ভাল হইয়া গেল। তখন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিলেন, আমি তোমাদিগকে বলি নাই যে, নামায তাহাকে একদিন মন্দ কাজ হইতে বিরত রাখিবে। এই হাদীস দ্বারা প্রমাণ হইল যে, নামাযের বরকতে এতবড় খারাপ লোকও মুত্তাকী পরহেযগার হইয়া গেল। এই হাদীসের দ্বারা ইহাও প্রমাণ হইল যে, যেমন হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফাসেক ব্যক্তিকে নিজের জামাআত হইতে বাহির করিয়া দেন নাই আমরাও এইরূপ লোকদিগকে জামাআত হইতে বাহির করিব না এবং

তাহাদিগকে নিয়মিতভাবে নামাযের তাকিদ করিতে থাকিব, তাহা হইলে নামাযের বরকতে নিজে নিজেই পরহেযগার হইয়া যাইবে। সুতরাং বেদআতী এবং ফাসেকের ঔষধ হাদীসের দ্বারা প্রমাণ হইল, আর ফাসেকের তাকিদের জন্য ইহাই যথেষ্ট যাহা ফেকাহ্র কিতাবে বর্ণনা করা হইয়াছে, যথা ঃ ফাসেক অভিশপ্তের দাওয়াত গ্রহণ করিবে না। আর যাহার উপার্জন একেবারে হারাম তাহার খানা খাইবে না। আর যাহার ঘরে ঢোল বাদ্য বাজে এবং নাচ-গান ও গর্হিত কাজ হয় তাহার দাওয়াত গ্রহণ করিবে না। তাহার ব্যাখ্যা حَقُّ الْيَقِيْنِ কিতাবে হেদায়া এবং আলমগীরী কিতাব হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে। ঐ কিতাবের এক অধ্যায়ে নিশাপুরীর পবিত্রতার মধ্যে বলা হইয়াছে, এক ব্যক্তি কোন স্ত্রীলোককে নিজের কাছে আসার জন্য ফুসলাইতেছিল। স্ত্রী লোকটি তাহার স্বামীর নিকট এই ঘটনা বর্ণনা করিল। তখন তাহার স্বামী নিজ স্ত্রীকে বলিল, তুমি ঐ ব্যক্তিকে এই কথা বলিয়া দাও "তুমি যদি আমার স্বামীর পিছনে ৪০ দিন পর্যন্ত ফজরের নামায পড়িতে পার তাহা হইলে তোমার কথামত কাজ করিব।" সেই ব্যক্তি ঐ রূপই করিল। তারপর স্ত্রীলোকটি ঐ পুরুষটিকে নিজের কাছে ডাকিল, তখন লোকটি বলিল, আমি মহান আল্লাহ্ তাআলার নিকট তওবা করিয়াছি। তখন স্ত্রীলোকটি তাহার স্বামীকে এই খবর দেওয়ায় তাহার স্বামী বলিল, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তাআলা নিজের কালামকে সত্যে রূপায়িত করিয়াছেন–

إِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

অর্থাৎ- "নিশ্চয় নামায মানুষকে পাপ কর্ম হইতে বিরত রাখে।"

সুব্হানাল্লাহ (আল্লাহ্ পবিত্র)! উত্তম স্ত্রীলোক নিজের স্বামীর আমানতকে কিভাবে রক্ষা করিয়াছেন। আর নিজের স্বামীর আমানতের খেয়ানত করার কুফল সম্বন্ধে অতি শীঘ্র দ্বিতীয় তদবীর বর্ণনা করিতেছি ইনশাআল্লাহ্। আর ঐ অধ্যায়ে حَاوِى الْقُلُوْبِ الطَّاهِرَةِ মধ্যে বর্ণনা করা হইয়াছে- নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন নামাযের কথা আলোচনা করিলেন এবং ইরশাদ ফরমাইলেন, যে ব্যক্তি নামাযের হেফাযত করিবে ঐ নামায কিয়ামতের দিন তাহার জন্য আলোকিত হইবে, দলিল হইবে এবং তাহাকে মুক্তি দানকারী হইবে। নামাযের হেফাযতের অর্থ- ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত, মুস্তাহাব ইত্যাদি যার যার স্থানে আদায় করা এবং মাকরূহ ও ফাসেক কাজ হইতে বাঁচিয়া থাকা, যেমন-পুরুষ হউক কিংবা

স্ত্রীলোক হউক নিজ নিজ সতরে আওরাত ঢাকিবে যাহা ফেকাহ্‌র কিতাবে বর্ণনা করা ইহয়াছে এবং পবিত্রতা ভালরূপে হাসেল করিবে। আর যে ব্যক্তি নামাযের হেফাযত করিবে না তাহার জন্য নামায আলো হইবে না এবং দলিলও হইবে না এবং তাহাকে মুক্তি দানকারীও হইবে না। সে কিয়ামতের দিন ফিরাউন, হামান, কারূন এবং উবাই ইবনে কা'বের সঙ্গে জাহান্নামের নিম্নস্তরে স্থান পাইবে। ইমাম আহমদ হইতে এই হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। এই চার জন কাফেরের কথা বিশেষ করিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে এই জন্য যে, এই চারজন কাফের সরদার ছিল। সুতরাং যে ব্যক্তি তেজারতের দরুন নামাযকে ছাড়িয়া দিবে সে উবাই ইবনে কা'বের সঙ্গী হইবে। আর যে ব্যক্তি রাজত্বের দরুন অর্থাৎ রাজ্যের এনতেজামে ব্যতিব্যস্ত থাকার দরুন নামায ছাড়িয়া দেয় সে ফিরাউনের সঙ্গী হইবে। আর যে ব্যক্তি মালের দরুন নামায ছাড়িয়া দিবে সে কারূনের সঙ্গী হইবে। আর যে ব্যক্তি সরদারীর দরুন নামাযকে ছাড়িয়া দিবে সে হামানের সঙ্গী হইবে।

মেশকাত শরীফের এক হাদীসে এই ব্যাপারে সমরকান্দী হইতে এক ঘটনা বর্ণনা করা হইয়াছে- পূর্বকালে এক ব্যক্তি শয়াতনকে বলিল, আমি তোমার মত হইয়া যাইব। শয়তান বলিল, তবে নামাযকে ছাড় এবং মিথ্যা কসম খাও।

এই কথার দ্বারা ইহাই প্রমাণ হইল যে, কেহ পুরুষ হউক কিংবা স্ত্রীলোক হউক যদি নামায ছাড়িয়া দেয় এবং মিথ্যা কসম খায় তবে সে শয়তানের মত হইল। অতঃপর এই কথার উপর মুসান্নেফ (লেখক রহঃ) বলিতেছেন, আমি হানাফী মাযহাবের কিতাব তাতারখানিয়ার মধ্যে দেখিয়াছি- 'এমন স্ত্রী যে নামায পড়ে না' স্বামী ইচ্ছা করিলে তালাক দিতে পারে যদিও সে স্ত্রীর মোহর আদায় করিতে অক্ষম। আসল কথা স্ত্রীর মোহর নিয়া আল্লাহ্‌র দরবারে উঠার চেয়ে তাহাকে সঙ্গে রাখাই ভাল।

এই কথা এখানে তাকিদের জন্য বলা হইয়াছে ইহার অর্থ এই নয় যে, স্বামীর উপর তালাক দেওয়া ওয়াজিব। অতঃপর লেখক বলিতেছেন, তাবকাতে ইবনিছ ছবকীতে ইবনিল বারযী ফতোয়া দিয়াছেন- যে স্ত্রী নামায ছাড়িয়া দেয় তাহাকে শাসন (মারা) করা স্বামীর উপর ওয়াজিব। এইভাবে রেওয়ায়েত আছে প্রত্যেক পিতা-মাতার উপর ছেলেমেয়েদিগকে সাত বৎসর বয়সের সময় হইলেই 'তাহারাত' (পবিত্রতা) নামায এবং

শরীআতের মাসআলা শিক্ষা দেওয়া ওয়াজিব। এই কথার উপর আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী ইবনে আবী তালেব (রাঃ) হইতে হাদীস বর্ণিত আছে- নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ ফরমাইয়াছেন, নামায আল্লাহ্ তাআলার খুশীর কারণ এবং ফেরেশতাদের ভালবাসার কারণ এবং ইহা সমস্ত নবীদের তরীকা (নিয়ম)। আর নামায মারেফাতের নূর ও ঈমানের মূল। আর দুআ কবূল হওয়া এবং আমল কবূল হওয়া, রোযী-রোযগারে বরকত হওয়ার জন্য কারণ স্বরূপ। মানুষের হাতিয়ার থাকে শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জন্য আর নামায শয়তান হইতে বিরত রাখার হাতিয়ার। নামায আদায়কারীর জন্য নামায মালাকুল মউতের নিকট শাফাআতকারী হইবে। আর নামায অন্তরের জ্যোতি, মুনকার-নাকিরের সওয়ালের জওয়াব। নামায আরামদায়ক এবং কিয়ামতের দিন পর্যন্ত তাহার সঙ্গে কবরে মুলাকাত করিবে, তারপর যখন কিয়ামত হইবে, নামায নামাযীর জন্য ছায়া দান করিবে এবং তাহার মাথার উপর তাজ হইবে এবং তাহার শরীরের কাপড় হইবে ও নূর হইয়া তাহার সম্মুখে দৌড়াইতে থাকিবে। আর নামাযী ও জাহান্নামের মধ্যে পর্দা হইবে এবং রাব্বুল আলামীনের নিকট দলিল হইবে আর মীযানের উপর ভারী হইবে এবং পুলসিরাত পার করাইবে আর বেহেশতের চাবি হইবে এই জন্য যে, নামাযের মধ্যে আল্লাহ্ তাআলার প্রশংসা, পবিত্রতা ও শ্রেষ্ঠত্ব এবং কোরআন শরীফ পড়া, দুআ এবং তাহমীদ করা হয়। আর বিশেষ করিয়া নামায সমস্ত আমলের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত।

নামাযের গুরুত্ব অন্তরে বদ্ধমূল হওয়ার জন্য ইহাই যথেষ্ট তবু তালেবীনদের মনের শান্তির জন্য 'নাযহাতুল মাজালিস' কিতাবে মে'রাজের অধ্যায় হইতে কিছু বিষয় লিখিয়া দিতেছি। তৎপূর্বে এই আয়াতের দিকে লক্ষ্য কর তাহা হইলে ঐ বিষয় সহজে হৃদয়ঙ্গম হইবে-

ثُمَّ دَنَا فَتَدَلّٰى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى

অর্থাৎ-"অতঃপর নিকটবর্তী হইলেন এবং আরো নিকটবর্তী হইলেন সুতরাং আরো নিকটবর্তী হইলেন দুই কানের বরাবর কিংবা তার চেয়েও নিকটবর্তী।"

মুসান্নেফ (লেখক রহঃ) বলিতেছেন, عُيُوْنُ الْمَجَالِسُ কিতাবে আছে, কোন আলেম বলিয়াছেন, আমি এই আয়াতে কারীমার ثُمَّ دَنَا

فَتَدَلّٰى এর অর্থ বিশ বৎসর পর্যন্ত উলামা এবং আরেফিনদের নিকট জিজ্ঞাসা করিতে থাকিতাম। অতঃপর আমি উহার সহীহ্ ব্যাখ্যা বুঝিতে পারিলাম, উহা হইল- আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মে'রাজের মধ্যে যখন ডান দিকে দৃষ্টি করিলেন নিজ প্রভূ আল্লাহ্ তাআলাকে দেখিতে পাইলেন, বামে দৃষ্টি করিলে প্রভূকে দেখিতে পাইলেন। এই ভাবে সম্মুখে, পশ্চাতে, উপরে, নীচে প্রভূকে দেখিতে পাইলেন। এমন পবিত্র ও বুযুর্গ জায়গা ছাড়িয়া আসিতে হইবে বিধায় হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্তরের খবর জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, হে মুহাম্মাদ! তুমি আমার রাসূল বান্দার প্রতি প্রেরিত হইয়াছ। যদি তুমি এই স্থানে সর্বদা থাক তাহা হইলে তুমি আমার রেসালাত লোকদের নিকট পৌছাইলে না। সুতরাং তুমি পৃথিবীতে অবতরণ কর এবং আমার বান্দাদেরকে আমার রেসালাত পৌছাইয়া দাও। আর যখন তুমি নামাযে দাঁড়াইবে তোমাকে এই মর্যাদাই দেওয়া হইবে। এই জন্যই হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন—

وَقُرَّةُ عَيْنِىْ فِى الصَّلٰوةِ

অর্থাৎ- "নামায আমার চক্ষের শান্তি।"

আর হাদীসে বর্ণনা করা হইয়াছে নামায মু'মিনদের জন্য মে'রাজ। ইহার আলোচনা আমার কিতাব نُوْرُ الْهُدٰى 'নূরুল হুদা'র মধ্যে দেখ। আর 'নাযহাতুল মাজালিস' কিতাবে ইহার বর্ণনায় লেখা হইয়াছে- কুরতুবী সূরায়ে আনআমের তাফসীরে বলিয়াছেন, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস এবং আবী ইবনে কাব একত্রে বলিয়াছিলেন, তখন ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, শুনিয়া রাখ আমরা বানূ হাশেম সুতরাং আমরা বলিতেছি, নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের প্রভূকে দুইবার দেখিয়াছেন। অতঃপর আরো বলিলেন তোমরা কি ইব্রাহীম (আঃ)-এর বন্ধুত্ব এবং মূসা (আঃ)-এর কালামকে আশ্চর্যবোধ করিতেছ। অন্য রেওয়ায়েতে আছে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্ তাআলাকে স্বচক্ষেই দেখিয়াছেন। তখন আবী ইবনে কাব এমন জোরে তাকবীর বলিলেন যে, পাহাড় হইতে তাহার উত্তর আসিল। আর ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) বলিলেন, আমি ঐ কথাই বলিব যাহা হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন- হুজূর নিজের প্রভূকে স্বচক্ষে দেখিয়াছেন।

এই অধমেরও এই আকিদা (বিশ্বাস) এবং ইহাই সহীহ ও শুদ্ধ। 'নাযহাতুল মাজালিস' কিতাবে ঐ অধ্যায়ে فَضْلُ الصَّلٰوةِ لَيْلاً وَنَهَارًا এর মধ্যে লেখা হইয়াছে- এক ব্যক্তি কসম করিয়াছে- সে যদি নহছ (মন্দ) দিন ছাড়া অন্যদিন তাহার স্ত্রীর নিকট যায় তবে স্ত্রী তালাক হইয়া যাইবে। অতঃপর এই ব্যাপারে আলেমদের নিকট মাসআলা জিজ্ঞাসা করা হইল। আলেমগণ উত্তর দিলেন, যে দিন সে যাইবে সেই দিনই তালাক হইয়া যাইবে। কেননা প্রত্যেক দিনই মুবারক, কোন দিনই নহছ নয়। অতঃপর এই ব্যাপারে কোন এক ব্যক্তি আবদুল আযীয দবরীর নিকট প্রশ্ন করিলেন। তখন তিনি উত্তর দিলেন, তুমি কি আজ ফজরের নামায পড়িয়াছ? তখন ঐ প্রশ্নকারী ব্যক্তি বলিলেন, না; তখন শেখ আবদুল আযীয বলিলেন, তুমি মুরাদুল মুরীদীন।

আজ নিজের স্ত্রীর নিকট যাইতে পার তালাক হইবে না কেননা অদ্যকার দিনটি তোমার জন্য নহছ।

সপ্তম উপকারঃ দ্বিতীয় তদবীরের বর্ণনাঃ এখানে এক মুরাকাবার তালীম এবং যিনা হইতে রক্ষা পাওয়ার তাকিদ বা হুঁশিয়ারী আলোচনা করিতেছি, যেমন- প্রত্যেক মানুষ চায় সে পুরুষ হউক কিংবা স্ত্রী হউক, পীর হউক বা মুরীদ হউক, সাধারণ লোক বা বিশেষ লোক হউক সকলেই ফেতনা-ফাসাদ, মিথ্যা অপবাদ, বদনামী, অপমান, অসম্মান, ঝগড়া-বিবাদ ইত্যাদি হইতে বাঁচিয়া থাকিবে। আর মানুষের মধ্যে শক্তিশালী থাকিবে। 'নাযহাতুল মাজালিস' কিতাবের بَابُ التَّقْوٰى وَفِعْلِ الْخَيْرَاتِ وَالْكف عَنِ الْمُنْكَرَاتِ অধ্যায়ে হযরত আলী (রাঃ) হইতে হাদীস বর্ণনা করা হইয়াছে- আল্লাহ্ তাআলার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে ভয় করিবে সে সমস্ত জীবন শক্তিশালী থাকিবে এবং আল্লাহ্‌র রাজত্বে আসান এবং শান্তির সহিত চলাফেরা করিতে পারিবে। এখন আল্লাহ্ তাআলাকে ভয় করা সম্বন্ধে এক মুরাকাবার তালীম বর্ণনা করিতেছি, উহা হইল- প্রত্যেক লোকই জানে এবং বলিয়াও থাকে যে, আল্লাহ্ তাআলা হাজির-নাজির। কোরআন শরীফ ও হাদীস শরীফে ইহা অনেক আলোচনা করা হইয়াছে। তার পরেও তাকওয়া-পরহেযগারী না করার কি অর্থ? আর আমানতে খেয়ানত করা এবং মানুষের হক আত্মসাত করা, মানুষের উপর অত্যাচার করা, যিনা করা, চুরি করা, সুদ খাওয়া, যাকাত না দেওয়া ইত্যাদি গর্হিত ও পাপের

কাজে লাগিয়া থাকার কি কারণ? তার একমাত্র কারণ আল্লাহ্ তাআলা হাজির-নাজির থাকার বিশ্বাস ও মুরাকাবা তাহার হাসেল হয় নাই। মুরাকাবার অর্থ ধ্যান-ধারণা এবং কল্পনা ও চিন্তা-ভাবনা করা। মুরাকাবার নমুনা হইল অন্তরে খুব ধ্যান, কল্পনা ও চিন্তা করিবে। আল্লাহ্ তাআলা আমাদের অতি নিকটে এবং আমাদের সঙ্গেই আছেন এবং আমাদের সমস্ত কার্যাবলী এবং যাহের-বাতেন সবকিছুই তিনি দেখিতেছেন। যখন এই মুরাকাবা হাসেল হইবে তখন নিজের সমস্ত আমলের দিকে ধ্যান করিবে। যেমন- ধ্যান করিবে আমি অমুকের নিকট হইতে একশত টাকা কর্জ নিয়াছিলাম, যখন সে ব্যক্তি আমার নিকট তাহার টাকা চাহিয়াছিল আমি বলিয়াছিলাম, আমিত টাকা তোমাকে দিয়া ফেলিয়াছি; আসলে আমি তাহার টাকা দেই নাই। তখন এই কথা ধারণা করিবে, যখন আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন কিয়ামতের দিন হিসাব-কিতাবের সময় আমাকে জিজ্ঞাসা করিবে কিংবা এখন হুজূরী মুরাকাবার সময় যদি জিজ্ঞাসা করে, তুমি অমুক ব্যক্তির টাকা দিয়াছ, তখন আমি কি বলিব? এই কথা নিজের অন্তরকে জিজ্ঞাসা কর, দেখ অন্তর কি উত্তর দেয়। হক কথা এই যে, কাহারো অন্তর আল্লাহ্ তাআলার নিকট মিথ্যা কথা বলিতে চায় না। অতঃপর অন্তরে এই কথাকেই বসাইয়া দাও। যখন এই মুরাকাবা অন্তরে হাসেল হইবে, তখন বুঝিবে তাকওয়া হাসেল হইয়াছে। এখন এই মুরাকাবার হাকীকত ভালরূপে বুঝে আসার জন্য ইমাম কাশিরীর (কুঃ রুঃ) রিসালার বিষয়বস্তুই যথেষ্ট, যথা- হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) কোন এক সময় ভ্রমণে গিয়াছিলেন। এক জায়গায় একটি বালককে বকরি চরাইতে দেখিতে পাইলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, বকরিগুলি হইতে তুমি কি একটি বকরি বিক্রয় করিবে? তখন বালকটি বলিল, এই বকরি আমার নয়। ইবনে ওমর (রাঃ) বলিলেন, তুমি মালিককে বলিবে এইগুলি হইতে একটি বকরি নেকড়ে বাঘে খাইয়া ফেলিয়াছে। বালকটি উত্তর দিল فَأَيْنَ اللّٰه অর্থাৎ- "আল্লাহ্ কোথায় গিয়াছেন?" অর্থাৎ আল্লাহ্ তাআলা তো কোথায়ও যান নাই, তিনি বিদ্যমান আছেন এবং সবছিুই দেখিতেছেন। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) এই ঘটনাকে দীর্ঘকাল পর্যন্ত লোকের নিকট বলাবলি করিতেন। আর ঐ বালকের এই কথা বলা "আল্লাহ্ কোথায় গিয়াছেন" অর্থাৎ আল্লাহ্ তাআলা নিকটে আছেন, সঙ্গে বিদ্যমান এবং দেখিতেছেন এই কামেল মুরাকাবা ঐ বালকের হাসেল ছিল। এই জন্য হযরত ইবনে ওমরের

বালকের এই কথার মধ্যে খুব তাছির মনে হইল ও তাহার কথার মধ্যে বেশ আনন্দ পাইলেন এবং এই কারণে এই কথাটি তিনি বারবার বলিতেন।

হেকায়েত ঃ হযরত মূসা (আঃ) বকরি চরাইবার জন্য বাহির হইলেন এবং এমন এক ময়দানে গেলেন যেখানে অনেক নেকড়ে বাঘ ছিল। তাঁহাকে নিদ্রায় অভিভূত করিয়া ফেলিল, তিনি চিন্তিত হইলেন ও ভাবিতে লাগিলেন এখন কি করিবেন। যদি বকরি চরাইতে থাকেন তবে নিদ্রার কারণে এই কাজে ব্যাঘাত ঘটিবে। আর যদি নিদ্রা যান তবে নেকড়ে বাঘ আসিয়া সমস্ত বকরিগুলি মারিয়া ফেলিবে। অতঃপর তিনি আকাশের দিকে চক্ষু উঠাইয়া চাহিলেন এবং বলিলেন, হে আল্লাহ্! তুমি সব কিছুই জান এবং তোমার ইচ্ছাই প্রতিফলিত হইবে এবং ভাগ্যলিপি লেখা হইয়া গিয়াছে। এই বলিয়া তিনি শুইয়া পড়িলেন। তারপর জাগ্রত হইয়া দেখিলেন একটি নেকড়ে ভাঘ তাহার লাঠি কাঁধে ফেলিয়া বকরি চরাইতেছে। এই অবস্থা দেখিয়া তিনি আশ্চার্যান্বিত হইলেন। তখন আল্লাহ্ তাআলা তাঁহার নিকট ওহী পাঠাইলেন- হে মূসা! তুমি এমন হইয়া যাও যেমন আমি চাই, তাহা হইলে আমিও তোমার জন্য এমন হইয়া যাইব যেমন তুমি চাও।

লক্ষ্য কর আল্লাহ্ তাআলার ইলম, ইচ্ছা এবং তাকদীরের কামেল মুরাকাবা হযরত মূসা (আঃ)-এর হাসেল হইয়াছিল। সেইজন্য দুনিয়াতেই ইহার ফল পাইলেন এবং তাঁহার মনের ইচ্ছা আল্লাহ্ তাআলা পূর্ণ করিলেন।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি যিনা করে অথবা শরাব পান করে তাহার অন্তর হইতে ঈমানকে বাহির করিয়া নেওয়া হয়। যেমন মানুষ তাহার শরীর হইতে জামা খুলিয়া নেয়। হযরত ইবনে আব্বাস এবং হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে- হযরত রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন মুসলমান স্বাধীন কিংবা বাঁদী মেয়েলোকের সঙ্গে যিনা করিল আল্লাহ্ তাআলা তাহার কবরে এক লক্ষ আগুনের দরজা খুলিবেন এবং প্রত্যেক দরজায় সাপ-বিচ্ছু আগুনের স্ফুলিঙ্গ থাকিবে। অতঃপর কিয়ামত পর্যন্ত তাহাকে আযাব করিতে থাকিবে। একদা এক ব্যক্তি বলিল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাকে যিনা করার অনুমতি দিন। উপস্থিত লোকেরা তাহাকে ধমক দিতে লাগিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাহাকে বলিলেন, বস। তখন

সে বসিল। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাহাকে বলিলেন, তুমি কি তোমার মার সঙ্গে যিনা পছন্দ কর? সে উত্তর দিল, আল্লাহ্র কসম কখনও না। তারপর বলিলেন, তোমার মেয়ের সঙ্গে? সে বলিল, না। তোমার বোনের সঙ্গে? সে বলিল, না। তোমার ফুফুর সঙ্গে? সে বলিল, না। তোমার খালার সঙ্গে? সে একই উত্তর দিতে লাগিল। বর্ণনাকরী বলিতেছেন, তারপর হযরত নিজের হাত তাহার হাতের উপর রাখিলেন এবং এই দুআ পড়িলেন-

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ ذَنْبَهٗ وَطَهِّرْ قَلْبَهٗ وَحَصِّنْ فَرْجَهٗ

অর্থাৎ- "হে আল্লাহ্ তাহার গুনাহ্সমূহ ক্ষমা করিয়া দাও, তাহার অন্তরকে পবিত্র করিয়া দাও এবং তাহার লজ্জাস্থানকে হেফাযত কর। তারপর হইতে সে ব্যক্তি আর কখনও এইরূপ কাজের দিকে খেয়াল করে নাই।

প্রকাশ থাকে যে, এই সমস্ত হাদীসের মধ্যে মুরাকাবার তালীম ছিল যেন লোকেরা সব ধ্যান করে এবং যিনা হইতে বাঁচিয়া থাকে এবং কাহারো সম্মানের হানি না করে এবং সম্মান ঠিক থাকে। আর শেষের হাদীসের দ্বারা উহা বুঝা গেল যে, আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ যুবককে মুরাকাবা এবং ধ্যান করার তালীম দিয়াছিলেন এবং তাহার হাতের উপর নিজের হাত মুবারক রাখিয়া এইরূপ করিলেন যাহার বরকতে সে মুত্তাকী পরহেযগার হইয়া গেল।

অষ্টম উপকার ঃ যিনা হইতে বাঁচার জন্য ঃ হযরত ওমর (রাঃ) হইতে হাদীস বর্ণিত আছে- নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ ফরমাইয়াছেন لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثُهُمَا الشَّيْطَانُ (মেশকাতুল মাসাবীহ্ كِتَابُ النِّكَاحِ দ্বিতীয় অধ্যায়) অর্থাৎ- "কখনও কোন পুরুষ কোন মেয়েলোকের সঙ্গে একত্র হইতে পারে না, তৃতীয় জন শয়তান থাকে"। অর্থাৎ উভয়ের মধ্যে তৃতীয় জন শয়তান থাকে। ঐ অধ্যায়ের মধ্যে অন্য আরেকটি হাদীস হযরত জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে- হযরত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, তোমরা এমন স্ত্রীলোকের নিকট আসিও না যাহার স্বামী অনুপস্থিত। মেশকাতুল মাসাবীহ্র باب عشرة النساء। এর দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) হইতে

হাদীস বর্ণিত আছে যে, হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ ফরমাইয়াছেন- যখন স্ত্রীলোকেরা পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামায আদায় করে এবং রমযানের রোযা রাখে এবং নিজের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে এবং নিজের স্বামীর তাবেদারী করে এমন বিষয়ে যাহা বিবাহের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে, সুতরাং ঐ স্ত্রীলোক বেহেশ্‌তের যে দরজা দিয়া ইচ্ছা প্রবেশ করিতে পারিবে। আর মেশকাতুল মাসাবীহ্ بَابُ النَّظْرِ إِلَى الْمَخْطُوبَةِ وَبَيَانِ الْعَوْرَاتِ এর প্রথম পরিচ্ছেদে হযরত জাবের (রাঃ) হইতে হাদীস বর্ণিত আছে- হযরত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ ফরমাইয়াছেন- সাবধান! তোমরা পুরুষগণ ثَيِّب (বিবাহিত) অন্য স্ত্রীলোকের ঘরে রাত্রি যাপন করিও না এবং স্ত্রী লোকেরা নিজের স্বামীর সঙ্গে রাত্রি যাপন করিবে এবং মাহরাম ব্যক্তির সঙ্গেও থাকিতে পার (যাহার সঙ্গে চিরকালের জন্য বিবাহ হারাম তাহাকে মাহরাম বলা হয়)। ثَيِّب (ছাইয়্যেব) এইজন্য বলা হইয়াছে যে কিশোরীর দ্বারা ফেতনা হওয়ার সম্ভাবনা কম, কেননা তাহারা পুরুষ সম্বন্ধে তত অবগত নয় এবং তাদের ভয়ও আছে। আর ثَيِّب (ছাইয়্যেব– বলা হয় ঐ স্ত্রীলোককে যাহার বিবাহ হইয়াছে। এখানে কোন কোন লোকের নিকট ছাইয়্যেবের অর্থ স্বামী ছাড়া স্ত্রীলোক। প্রকাশ থাকে যে, ছাইয়্যেবের অর্থ যুবতী মেয়েলোক অর্থাৎ যুবতী বিধবা মেয়েলোক হউক কিংবা তাহার স্বামী ঘরে না থাকুক উভয় অবস্থাতে এইরূপ স্ত্রীলোকের ঘরে থাকা নিষেধ। মেশকাতুল মাসাবীহ্‌র بَابُ بَيَانِ الْخَمْرِ وَوَعِيْدِ شَارِبِهَا -এর তৃতীয় পরিচ্ছেদে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে হাদীস বর্ণিত আছে- হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ ফরমাইয়াছেন, তিন ব্যক্তির জন্য আল্লাহ্ তাআলা বেহেশ্‌ত হারাম করিয়াছেন ঃ (১) যে সর্বদা শরাব পান করে (২) পিতা-মাতাকে কষ্টদানকারী সন্তান এবং (৩) যে ব্যক্তি কোন নির্লজ্জ কলুষিত লোককে নিজের পরিবার পরিজনের মধ্যে স্থান দেয়। অর্থাৎ এই ধরনের লোককে ঘরে স্থান দিলে নিজের পরিবার ও ছেলে-মেয়েদের মধ্যে খারাপ চাল-চলন এবং গুনাহ্‌র কাজ প্রসার লাভ করে। কারণ সে ফাসেক লোকদের ঘরে যাতায়াত করিতে লজ্জাবোধ করে না এবং ছেলে-মেয়েরা অপরিচিত ব্যক্তির সম্মুখে যাতায়াত ও তাহাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলিলেও সে নিষেধ করে না। আর মেশকাতুল মাসাবীহ بَابُ الْجَمَاعَةِ وَفَضْلِهَا -এর প্রথম

পরিচ্ছেদে হযরত আবূ মূসা (রাঃ) হইতে হাদীস বর্ণিত আছে- হযরত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ ফরমাইয়াছেন, যে চক্ষু কু-দৃষ্টি করে অর্থাৎ যে পুরুষ কুপ্রবৃত্তির তাড়নায় ভিন্ন মেয়েলোকের দিকে খারাপ দৃষ্টিতে দেখে এবং যে মেয়েলোক ঐরূপ ভিন্ন পুরুষের দিকে দেখে সে চক্ষু যেন যিনা করিল। চক্ষের যিনার অর্থ - যদি কোন স্ত্রীলোক ভিন্ন পুরুষের মজলিসে সুগন্ধি ইত্যাদি লাগাইয়া যায় এবং ধারণা করে যে লোকেরা খাহেশের সঙ্গে তাহার শরীরটা দেখুক তাহা হইলে এই স্ত্রীলোকটিও যিনাকারীণীর মধ্যে গণ্য হইবে। (তিরমিযী)।

যে পুরুষ এবং স্ত্রীলোক খাঁটি মুসলমান হইয়াছে, আল্লাহ্ এবং কিয়ামতের দিবসের প্রতি পূর্ণ ঈমান আনিয়াছে সে এই কাজ হইতে ভীষণ ভয় পাইবে। কোন মেয়েলোকও এমন কাজ করিবে না এবং পুরুষও নিজ স্ত্রীর জন্য এমন কাজের প্রচলনকারী হইবে না। আর যে স্ত্রীলোক নিজের স্বামীর সম্মুখে ময়লা কাপড়-চোপড় পরিধান করে অথচ যখন অন্য লোকের বাড়ীতে যায় তখন আতর-গোলাপ লাগাইয়া ভাল ভাল কাপড় পরিয়া যায়, ইহা তাহার জন্য খুবই খারাপ কথা। আল্লাহ্ তাআলা এইরূপ কাজ করা হইতে তাহাদেরকে তওবা করার তাওফীক দান করুক। মেশকাতুল মাসাবীহ্‌র كِتَابُ النِّكَاحِ এর তৃতীয় পরিচ্ছেদে হযরত আবূ উমামা (রাঃ) হইতে হাদীস বর্ণিত আছে- হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ ফরমাইয়াছেন, আল্লাহ্‌র তাকওয়া হাসেল করার পর মুসলমানের জন্য সর্বোত্তম বস্তু নেক্‌কার (সতী) স্ত্রী। তাহার (স্ত্রীর) চরিত্র এমন হইবে যে, যখন তাহার স্বামী তাহাকে কোন কাজের আদেশ দিবে, সে সন্তুষ্টচিত্তে তাহা করিবে। আর যখন তাহার স্বামী তাহার দিকে দৃষ্টি করিবে, মন খুশীতে ভরিয়া যাইবে। আর স্বামী যদি তাহার স্ত্রীর দ্বারা কোন কাজ করাইবার কসম করে, তবে সে উহা সত্যে পরিণত করিবে এবং স্বামীর অসাক্ষাতে তাহার শুভ কামনা করিবে। আর নিজের শরীরকে খারাপ কাজ হইতে ও ফাসেক কাজ হইতে বাঁচাইবে এবং স্বামীর মাল ইত্যাদিতে শুভকামনা করিবে ও উহার মধ্যে খেয়ানত করিবে না। (ইবনে মাজাহ্)

যখন স্বামী-স্ত্রী এই হাদীসের উপর আমল করিবে অর্থাৎ পুরুষ এই রকম স্ত্রীলোক দেখিয়া বিবাহ করিবে এবং বিবাহের পর এই হাদীস শুনাইয়া নিজ স্ত্রীর দ্বারা আমল করাইবে এবং স্ত্রী ঐ রকম হইবে যেমন

হাদীসে বর্ণনা করা হইয়াছে, তখন সমস্ত গোলমাল নিজে নিজেই মিটিয়া যাইবে। বাকী পর্দার অধ্যায়ের বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যা আমার রিসালা تَزْكِيَةُ النِّسْوَان -এর মধ্যে দেখ। এখন সমস্ত হাদীসের মধ্যে বর্ণিত যে খারাপ কাজ পুরুষের দ্বারা হয় তাহা হইতে পুরুষগণ বাঁচিয়া থাকিবে। আর যে সমস্ত খারাপ কাজ মেয়েলোক দ্বারা সংঘটিত হয় তাহা হইতে মেয়েলোকেরা বাঁচিয়া থাকিবে। আর এই সমস্ত কথাকে হাসি তামাশা মনে করিয়া নিজ পয়গম্বরের রাস্তা হইতে সরিয়া পড়িবে না।

নবম উপকার : মানুষের সৃষ্টিগত ও স্বভাবগত চরিত্র এইরূপ যে, কুফরী হইতে যিনাকে অত্যধিক ঘৃণা করে, চাই সে মুসলমান হউক কিংবা কাফের হউক। এ ব্যাপারে স্মরণযোগ্য যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমস্ত খারাপ কাজ হইতে নিষেধ করিয়া নিজ উম্মতদিগকে খারাপ কাজ হইতে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু যিনা হইতে মানুষকে ফিরাইবার জন্য খুব দূরদর্শিতা এবং বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়াছেন। তাহার কারণ এই যে মানুষ কুফরী হইতে যিনার প্রতি অত্যধিক ঘৃণা পোষণ করে, যেমন نُزْهَةُ الْمَجَالِس কিতাবের بَابُ حِفْظِ الْأَمَانَةِ وَتَرْكِ الْخِيَانَةِ এর মধ্যে হযরত নূহ ও হযরত লূত (আঃ)-এর বিবিদের খারাবী সম্বন্ধে বর্ণনা করিয়াছি। যদি কেহ এই কথা বলে যে, ইহা কি করিয়া সম্ভব হইতে পারে যে, নবীর স্ত্রী কাফের হইবে এবং যিনাকারীণী হইবে; তবে ইহার উত্তর হইল- আল্লাহ্ তাআলা নবীদিগকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার জন্যই কাফেরদের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন অর্থাৎ তাহাদিগকে দ্বীন ইসলামের দিকে ডাকিবে এবং নিজের দিকে আকৃষ্ট করিবে। সুতরাং তাঁহার সঙ্গে এমন ব্যক্তি থাকিবে না যাহাকে কাফেরগণ ঘৃণা করে। আর সমস্ত ঘৃণার বস্তুর মধ্যে যিনা সবচেয়ে ঘৃণার বস্তু, কুফরী তাহার বিপরীত কেননা কুফরীর প্রতি কাফেরদের তত ঘৃণা হয় না।

এখন সম্মুখে যে বিষয় আলোচনা হইবে তাহা শুধু মেয়েলোকদের জন্য নির্দিষ্ট, তাহার উপর শুধু মেয়েলোকেরাই আমল করিবে, ইহার খেলাফ করা হইতে ভীত হইবে এবং আমার খলিফাগণ এই সমস্ত বিষয়বস্তু মেয়েলোকদিগকে ভালভাবে বুঝাইয়া দিবে।

দশম উপকার : শুধু মেয়েলোকদের জন্য নির্দিষ্ট : স্ত্রী তাহার স্বামীর আমানতের হেফাযত করিবে অর্থাৎ ভিন্ন পুরুষের সঙ্গে কখনও

কোন অবৈধ সম্পর্ক রাখিবে না। যদি কোন প্রকার সম্পর্ক রাখা হয় তাহা হইলে আমানতের খেয়ানত কারিণীর মধ্যে গণ্য হইবে। এবং ভয়ানক আযাব ভোগ করিতে হইবে। স্বামীর আমানতে খেয়ানত করিলে বড় বড় পাহাড় হেলিয়া যায় কাজেই মেয়েলোকদের কি অবস্থা হইবে তাহা نُزْهَةُ الْمَجَالِس। কিতাবে بَابُ حِفْظِ الْاَمَانَةِ وَتَرْكِ الْخِيَانَةِ এর মধ্যে বর্ণনা করিয়াছি।

হেকায়েত ঃ ইমাম জাফর সাদেক ইবনে ইমাম মুহাম্মাদ (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে, বানী ইসরাঈল গোত্রের মধ্যে একজন নেককার লোক ছিলেন। তাহার স্ত্রী ছিল খুব সুন্দরী। কোন এক যুবক তাহাকে দেখিতে পাইল। অতঃপর স্ত্রীলোকটি ঐ যুবকের প্রতি আশেক হইল, এমনকি তাহার ঘরের দরজা খোলার জন্য একটি চাবি বানাইয়া ঐ যুবকের হাতে দিল। যুবক যখন ইচ্ছা তাহার ঘরে যাতায়াত করে। একদিন তাহার স্বামী বলিল, তোমাকে আমার সন্দেহ হইতেছে সুতরাং আমার নিকট তোমার এই কথার কসম করিতে হইবে যে, তুমি আমার আমানতে খেয়ানত কর নাই। স্ত্রীলোকটি উত্তর দিল, আচ্ছা বেশ। তারপর যখন তাহার স্বামী বাহিরে গেল তখন ঐ যুবক স্ত্রীলোকটির নিকট আসিল। স্ত্রীলোকটি তাহাকে উক্ত খবর শুনাইলে যুবক বলিল, তাহা হইলে এখন বাঁচার উপায় কি? স্ত্রীলোকটি বলিল, তুমি এক প্রতারকের পোশাক পরিয়া একটি গাধা নিয়া শহরের দরজায় দাঁড়াইয়া থাকিবে, সে ঐরূপ করিল। তারপর স্ত্রীলোকটির স্বামী আসিয়া তাহার স্ত্রীকে ঐ পাহাড়ে কসম খাওয়াইবার জন্য ডাকিল, যে পাহাড় বানী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের নিকট সম্মানিত; লোকেরা সে পাহাড়ের নিকট গিয়া কসম খায়। স্ত্রীলোকটি তাহার স্বামীর সঙ্গে উক্ত পাহাড়ের উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া যখন ঐ প্রতারককে দেখিল তখন স্ত্রীলোকটি বলিল, তাহার সঙ্গে আমার সওয়ার হওয়া দরকার। তখন স্বামী তাহাকে ঐ প্রতারকের সঙ্গে সওয়ার করাইয়া দিল। তারপর তিন জনই পাহাড়ে উঠিল এবং স্ত্রীলোকটি স্ব-ইচ্ছায় গাধার উপর হইতে পড়িয়া গেল, তাহাতে তাহার শরীরের কিছু অংশ অনাবৃত হইয়া গেল। স্ত্রী-লোকটি বলিল, আল্লাহ্‌র কসম আমাকে এই ব্যক্তি ছাড়া আর কেহ দেখে নাই। তারপর এই তিন ব্যক্তিকে নিয়া পাহাড় খুব জোরে কাঁপিতে আরম্ভ করিল। এই দিকে লক্ষ্য করিয়াই আল্লাহ্ তাআলা ফরমাইয়াছেন–

وَاِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُوْلَ مِنْهُ الْجِبَالُ

অর্থাৎ "তাহাদের প্রতারণার দরুন পাহাড় কাঁপিতে লাগিল।" তাফসীরে জালালাইনে ইহার অর্থ এই লিখিয়াছেন যে, কাফেরের প্রতারণা বিশ্বাসের যোগ্য নয় এবং কাহাকেও কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না বরং তাহার নিজেরই ক্ষতি হইবে। এই স্থানে লেখক এই আয়াত এই জন্য লিখিয়াছেন যে, কাফেরের প্রতারণা এমন নয় যে পাহাড় হেলিয়া যাইবে বরং কাফেরগণ দূর্বল হয় (فتح الرَّحمٰن) আর এই স্ত্রী লোকটির প্রতারণা এইরূপ ছিল না যে, পাহাড় হেলিয়া যাইবে। আর উক্ত আয়াতে কারীমার দ্বারা ইহাই বুঝা যাইতেছে যে, উহার দ্বারা পাহাড় হেলিয়া যায় যেহেতু এই স্ত্রীলোকটির প্রতারণায় এইরূপ হইয়াছে। এই আয়াতের বর্ণনা তাফসীরে বাগভীর মধ্যে দেখ। হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রাঃ) হইতে হাদীস বর্ণিত আছে- হযরত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ ফরমাইয়াছেন, যে স্ত্রীলোক নিজের স্বামীর আমানতে খেয়ানত করে তাহাকে সমস্ত উম্মতের অর্ধেক আযাব দেওয়া হইবে।

আর ঐ কিতাবে فَصْلٌ فِى الْمِعْرَاجِ -এর মধ্যে লিখিত আছে- হযরত আলী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, আমি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া দেখিলাম হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাঁদিতেছেন। আমি তাঁহার কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিলেন, আমি মে'রাজের রাত্রে দেখিতে পাইলাম আমার উম্মতের মেয়েলোকদের খুব কঠিন আযাব হইতেছে। আর একজন মেয়েলোককে দেখিলাম তাহার দুই স্তন লটকাইয়া রাখা হইয়াছে এবং তাহা হইতে বিন্দু বিন্দু দুধ তাহার গলার মধ্যে পড়িতেছে। ঐ স্ত্রীলোকটি এমন ছিল যে, স্বামীর আদেশ ব্যতীত অন্য লোকের শিশু সন্তানকে দুধ পান করাইত। আর এক জায়গায় এক জন মেয়েলোককে দেখিলাম তাহাকে লটকাইয়া রাখা হইয়াছে, তাহার নীচে প্রজ্জ্বলিত আগুন, সে নিজের শরীরের মাংস খাইতেছে। উহার কারণ সেই স্ত্রীলোক নিজের স্বামী ছাড়া অন্য পুরুষকে দেখাইবার জন্য সাজিয়া-গুজিয়া থাকিত।

হাদীসে আরও বর্ণিত আছে-যদি কোন স্ত্রীলোক অন্য পুরুষকে দেখাইবার জন্য সুরমা ব্যবহার করে তাহা হইলে আল্লাহ্ তাআলা তাহার মুখকে কাল বর্ণ করিবেন আর তাহার কবরকে একটি আগুনের কুণ্ডে পরিণত করা হইবে।

তৃতীয় ওয়াজ

মুনাফেকগণ হেদায়েতের রাস্তা বন্ধ করিবার জন্য ওয়াজকারীদিগকে নানা রকম ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। আর ওয়াজকারীদের খরচ বহন বন্ধ করার জন্য যে সমস্ত সন্দেহ বিস্তার করা হইয়াছে ঐ সব সন্দেহ দূর করিবার জন্য যে সমস্ত দলিল পেশ করা হইবে, তাহা শুনিয়া মুসলমানগণ তাহাদের দ্বীনের সম্মান করিবে এবং দ্বীনের হেফাযতের জন্য আলেমদিগকে সাহায্য করিবে, আর দ্বীনের দুশমন মুনাফেকদের কথাকে মিথ্যা বলিয়া মনে করিবে এবং তাহাদের কথায় যে সমস্ত ফাসাদের সৃষ্টি হইয়াছে তাহা দূরীভূত করিবে। আর এই ওয়াজের মধ্যে চারটি উপকার বর্ণনা করা হইবে।

প্রথম উপকার ঃ মুনাফেকদের সন্দেহ দূর করার জন্য প্রতিবাদ স্বরূপ এখানে আলোচনা করা হইবে-বাংলাদেশের কোন কোন জায়গায় মুনাফেকগণ বলিয়া থাকে যে, আলেমগণ নিজেরা যাকাত গ্রহণ করার জন্য লোকদের নিকট যাকাত প্রদান করার কথা বর্ণনা করে। সুতরাং এই কথার প্রতিবাদের বিশেষ কোন প্রয়োজন মনে করি না, কারণ এই ব্যাপারে কোরআন মাজীদের অনেক জায়গায় বর্ণনা করা হইয়াছে- وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ হাদীসের কিতাব যেমন مِشْكٰوة مَصَابِيْح ইত্যাদি কিতাবের كِتَابُ الزَّكٰوة অধ্যায়ে যাকাত আদায় করার তাকিদ এবং না দেওয়ার শাস্তি বর্ণনা করা হইয়াছে। সুতরাং ইহাই যথেষ্ট মনে করি। আর সমস্ত পৃথিবীর মুসলমানগণ জানেন যে, কালিমা, নামায, যাকাত, রোযা, হজ্জ এই পাঁচটি ইসলামের স্তম্ভ বা বুনিয়াদ। সুতরাং যাকাতের হুকুম মুশরেক এবং মুনাফেকদের জন্য ভারী বোঝা বলিয়া মনে হইবে। আল্লাহ্ তাআলা ফরমাইয়াছেন-

كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ مَا تَدْعُوْهُمْ اِلَيْهِ

অর্থঃ "মুশরেকদের উহা বোঝাস্বরূপ, যে দিকে তাহাদিগকে আহ্বান করা হইতেছে।" (সূরায়ে শুরাঃ ২৫ পারা)

অর্থাৎ যদি তাহাদিগকে তাওহীদ, দ্বীন-ইসলাম এবং দ্বীনের সমস্ত হুকুম আহকামের দিকে আহ্বান করা হয় ইহা তাহাদিগের জন্য বোঝাস্বরূপ মনে হইবে। ইহা দ্বারা এই প্রমাণ হইল যে, যাহারা এইরূপ কথা বলে, তাহারা মুশরেক। মুসলমানের দাবী করিয়া যাহারা এইরূপ কথা-বার্তা বলে আসলে তাহারা শুধু মুখে মুখেই স্বীকার করে অন্তরে নয়, এইরূপ ব্যক্তি মুনাফেক।

আর কোন কোন জায়গায় মুনাফেক লোকেরা বলিয়া থাকে, যে সমস্ত লোকেরা দেশে দেশে ওয়াজ-নসিহত করিয়া থাকে, তাহারা শুধু টাকা পয়সা উপার্জনের উদ্দেশ্যেই করে। এই অপবাদের প্রতিবাদ আমি তৃতীয় উপকারে 'মুর্খতা দূষণীয়' এই আলোচনায় বর্ণনা করিব এবং চতুর্থ উপকারেও এই অপবাদ খণ্ডন করা হইবে। আর এইরূপ সন্দেহ বিস্তার করার কারণ হইল-মুনাফেক লোকদের জন্য দ্বীনের আহকাম শ্রবণ করা বোঝাস্বরূপ মনে হয় এবং আলেমদের বর্ণনার দ্বারা মুনাফেকদের পরিচয় হইয়া যায়। মুনাফেকগণ যেহেতু মুসলমানদিগকে পথভ্রষ্ট করিতে এবং ঢোল বাজান, নাচ-গান, রং-তামাশা ইত্যাদি প্রচলন করিতে পারে না, সেহেতু এই ধরনের মিথ্যা অপবাদ দ্বারা মূর্খ লোকদিগকে পথভ্রষ্ট করিতে ইচ্ছা করে। আর ওয়াজকারীদিগকে শাসাইতে থাকে যাহাতে তাহারা লজ্জিত হইয়া বদনামীর ভয়ে দেশে দেশে ওয়াজ নসিহত করা ছাড়িয়া দেয়। সুতরাং এই সন্দেহের জন্য আলেমগণ দেশে দেশে ওয়াজ-নসিহত করা হইতে বিরত হইবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হুকুমের দিকে লক্ষ্য করিয়াই আলেমগণ ওয়াজ-নসিহত করিয়া থাকেন এবং ওয়াজ নসিহত করা মুর্শিদী মরতবার শর্তের অন্যতম যেমন সম্মুখের দিকে বুঝা যাইবে ইনশাআল্লাহ্। এই সন্দেহের দ্বারা মুসলমানদের উপকারই হইবে। দ্বীনের দুশমনদিগের পরিচয় পাওয়া যাইবে। যদি এইরূপ সন্দেহ বিস্তারকারীদের নিকট কেহ মুরীদ হয় তবে তাহার এই বায়আত হইতে তওবা করা দরকার। কেননা এইরূপ ব্যক্তি কখনও মুর্শিদ হইতে পারে না। বরং এইরূপ লোক মুর্শিদের মর্যাদা ধ্বংসকারী। আলেমগণ দ্বীনের মাসআলা জানেন। যদি লোকেরা ইচ্ছা করিয়া তাঁহাদের খরচ বহন করে তবে ভাল কথা, অন্যথায় যাহাকে আল্লাহ্ তাআলা খেদমত করার ভার সোপর্দ করিয়াছেন সে মানুষের নিকট হইতে টাকা-পয়সা নিয়া আলেমদেরকে দিবে। আর যে দেশে এইরূপ কোন খাদেম থাকিবে না সেখানে আলেমগণ নিজে শরীআতের হুকুম অনুযায়ী নিজের খরচ পরিমাণ টাকা-পয়সা লোকদের নিকট হইতে নিবে এবং ওয়াজ-নসিহত করিতে থাকিবে। আর খাদেমের খেদমত করার বর্ণনা এবং আলেমদের নিজ খরচ নেওয়া দূরস্ত হওয়ার আলোচনা চতুর্থ উপকারে লিখিব ইনশাআল্লাহ।

দ্বিতীয় উপকারঃ মুনাফেকগণ সন্দেহ বিস্তার করার দরুন যে গোলমালের সৃষ্টি হইয়াছে, এই সন্দেহ হইতে সাবধান করিবার জন্য এ

ব্যাপারে নিম্নে আলোচনা করিতেছি। পূর্বে বাংলাদেশে খারেজী এবং অন্য এক সম্প্রদায় হইতে এই ধরনের সন্দেহের কথা শুনিতাম। সুতরাং এই সমস্ত কথা আমার রিসালা حجب قاطعه এর মধ্যে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। খারেজীদের অবস্থা হইল- তাহারা কোন ওয়াজ-নসিহত করে না, তাহারা জুমুআ, দুই ঈদের নামায এবং বে-নামাযীর জানাযার নামায পড়া এবং মুরীদ হওয়া হইতে নিষেধ করে এবং নিজের সম্প্রদায়ের মোকাদ্দমার ফয়সালা কোরআনের খেলাফ করিয়া শুধু নিজের জ্ঞান দ্বারা সম্পন্ন করে। শাস্তিস্বরূপ লোকদিগকে জুতা মারে এবং জরিমানা আদায় করে ও তাহা নিজেরা ভোগ করে। জরিমানা করিয়া শাসন করা কোন ইমামদের নিকটই জায়েয নাই। শুধু ইমাম আবূ ইউসুফ জরিমানা করিয়া শাস্তি দেওয়া জায়েয রাখিয়াছেন এই শর্তে যে, ঐ জরিমানার মাল নিজেও খাইবে না এবং বাইতুল মালেও জমা দিবে না বরং ঐ মাল ঐ ব্যক্তি সংশোধন হওয়ার পর তাহাকে ফেরত দিবে (ফতোয়ায়ে আলমগীরী كِتَابُ الْحُدُوْد এর ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। আমাদের সম্প্রদায়ের কোন কোন মুর্শিদ বে-নামাযীদেরকে কোন কোন জায়গায় মারপিট করে, ইহা মূর্খতা ছাড়া আর কিছু নয়। তাহারা খারেজী এবং ওহাবীদের রীতি-নীতি পছন্দ করিয়া নিয়াছে। আর এই মুর্খেরা ইহার মধ্যেই শরীআতের শান-শওকাত বুঝিতেছে। মোটকথা, যে কথা শরীআতে নিষেধ উহা প্রচলন করিলে ইহা দ্বীনকে ধ্বংস করিয়া দেওয়ার শামিল।

১২৮৮ হিজরীতে যখন আমি পূর্ণিয়া জিলায় সফরে গমন করি তখন আমার খলিফা ইমাম বখশের নিকট শুনিতে পাইলাম এবং আমি নিজেও দেখিলাম, কোন কোন জায়গায় কোন কোন হেদায়েতকারী ঐ সন্দেহের অপবাদের ভয়ে যাকাত এবং সদকায়ে-ফেতর দেওয়ার মাসআলা লজ্জায় বর্ণনা করেন না। তাহাদের খরচ নিবার ক্ষমতা কোথায়? এমন কি এই অবস্থা হইল যে, কোন কোন জায়গায় মুনাফেকদের প্ররোচনায় তাহারা ওয়াজকারীদেরকে ঘৃণা করিতে লাগিল এবং ওয়াজও মনোযোগ দিয়া শুনিত না। আর খয়রাতের মত যদি তাহাদিগকে কিছু দেওয়া হইত তবে নিত, তাহা না হইলে নিত না। নৌকার ভাড়া ইত্যাদির জন্য তাহারা ঋণগ্রস্ত হইয়া নিজের ঘরে ফিরিয়া আসিল। অবশেষে তাহার পরিণাম হইল- ওয়াজকারীগণ নিজের ঘরে বসিয়া পড়িলেন এবং ওয়াজ করা বন্ধ করিয়া দিলেন। যাহারা হেদায়েত পাইয়াছিল তাহারা পুনরায় পথভ্রষ্ট হইয়া গেল।

পূর্বে যাহারা আলেমদের নাম শুনিয়া তাঁহাদের সঙ্গে মুলাকাত করিবার জন্য দৌড়াইয়া আসিত, এখন আর তাহারা আলেমদের নিকট যায় না। মেয়েলোকেরা যাহারা পর্দা করিত, লম্বা আস্তিনের জামা পড়িত তাহারা পর্দা ছাড়িয়া দিয়া নদীতে গোসল করা আরম্ভ করিল; যাহার ফলে তাহাদের স্তন, পেট এবং শরীরের নানা অংশ বাহির হইয়া পড়িত এবং মুসলমান মেয়েলোকেরা হিন্দু মেয়েলোকদের মত কপালে সিন্দুর ব্যবহার করিতে লাগিল। যাহারা তাজিয়া বহন করা ছাড়িয়া দিয়াছিল পুনরায় তাহা আরো বেশী করিতে লাগিল এবং মেয়েলোকদের তাজিয়ার নিকট গমন এবং মাতুম জারী করা পূর্বের চেয়েও বেশী হইতে লাগিল। লোকে-জমজমাট মসজিদ জনশূন্য হইয়া গেল, তাহার মধ্যে গরু, ঘোড়ার গোবর এবং মুসাফিরদের চুলা তৈয়ার হইল-ইহা আমি নিজ চক্ষে দেখিয়াছি। আর যাহারা ঢোল বাজান ছাড়িয়া দিয়াছিল তাহারা পুনরায় সে কাজ আরম্ভ করিল। আর লা-মাযহাবীরা শূন্য ময়দান পাইয়া তোড়-জোড় লাগাইল। আর কিছু কিছু লোক যাহাদের মধ্যে নামায ও দ্বীনদারী এখনও বাকী আছে তাহাদিগকে নানা প্রকার সন্দেহের শিকার বানাইতে লাগিল এবং তাহাদের দ্বীন ও মাযহাব ধ্বংস করিতে লাগিল। এমনকি আমি কিছু কিছু লোককে জিজ্ঞাসা করিলাম তোমাদের মাযহাব কি? তাহারা উত্তর দিল, আমরা মূর্খ লোক মাযহাব সম্বন্ধে আমরা কি জানি,আমাদের মাযহাব মুহাম্মাদী। এইভাবে লোকেরা দ্বীনের খেলাফ কাজ আরম্ভ করিল এবং পূর্বের আমল এবং মাযহাব ছাড়িয়া লা-মাযহাবীর মধ্যে পাকা হইতে লাগিল।

আশ্চর্য কথা ঃ এক ব্যক্তি ইলাহাবাদের নিকটবর্তী মউকার বাসিন্দা লা-মাযহাবী, মুর্শিদাবাদ এবং মালদহের মধ্যবর্তী স্থানে গ্রামে গ্রামে আসিত। মানুষদিগকে বোকা পাইয়া বেশ গোম্‌রাহ করিতে লাগিল। এমনকি লা-মাযহাবীদের কথাবার্তা লোকদিগকে শিখাইতে লাগিল এবং জুমুআর দিনের প্রথম আযান এবং নামাযের পর দুআ করা নিষেধ করিয়া দিল। বোকা লোকেরাও এই দুইটি কথা সমস্ত পৃথিবীর মুসলমান এবং দ্বীনের কিতাবের বিরুদ্ধে হওয়া সত্ত্বেও মানিয়া নিল। এমনকি ইহা লা-মাযহাবীদেরও বিরুদ্ধে। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ 'আল্লাহ্‌র প্রশংসা' যখন এই অধম (লেখক) এই সমস্ত জায়গায় আসিল এবং ওয়াজ শুনাইতে আরম্ভ করিল, হাজার হাজার মানুষ মুরীদ হইতে আরম্ভ করিল। ছয় মাসের সফরেই আমি একজনও লা-মাযহাবী ও গোমরাহকারী খুঁজিয়া পাই নাই,

সকলেই পালাইয়া গিয়াছে। সুতরাং এখন দ্বীনের ইলম শিক্ষা করা মুসলমানদের উপর জরুরী অর্থাৎ ওয়ারেছে-নবীর মধ্যে যাহারা আলেম তাহাদের কথা শুনিবে, ইহাও দ্বীনি ইলম শিক্ষা করার মত।

প্রথম উপদেশ ঃ 'নাযহাতুল মাজালিস' কিতাবের بَابُ فَضْلِ الْعَقْلِ। এর মধ্যে আছে, আল্লাহ্ তাআলা ফরমাইয়াছেন–

إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَذِكْرٰى لِمَنْ كَانَ لَهٗ قَلْبٌ

অর্থঃ "নিশ্চয় ইহার মধ্যে নসিহত ও উপদেশ রহিয়াছে যাহাদের অন্তর আছে অর্থাৎ আকল আছে।" (সূরায়ে কাফ ঃ ২৬ পারা)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে- আল্লাহ্ তাআলার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ ফরমাইয়াছেন, নামাযী, রোযাদার, হাজী, মুজাহিদ প্রত্যেকের নিজ নিজ আকল অনুপাতে পুরস্কার দেওয়া হইবে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে আরো হাদীস বর্ণিত আছে- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন, প্রত্যেক জিনিসের হাতিয়ার আছে, মু'মিনের হাতিয়ার আকল। প্রত্যেক বস্তুর বহনকারী আছে, মুমিনের বহনকারী আকল। প্রত্যেক জিনিসের একটি স্তম্ভ আছে, মুমিনের স্তম্ভ আকল। প্রত্যেক বস্তুর সীমা আছে, মুমিনের সীমা আকল। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য একজন রক্ষাকারী আছে, আবেদের রক্ষাকারী আকল। প্রত্যেক ব্যবসায়ীর মূলধন আছে, মুজাহিদগণের মূলধন আকল। প্রত্যেক পরিবারের জন্য একজন পরিচালনাকারী রহিয়াছে, ছিদ্দিকীনদের পরিচালনাকারী আকল। প্রত্যেক অনাবাদী জায়গার জন্য আবাদকারী রহিয়াছে, আখেরাতের আবাদকারী আকল।

লতিফা ঃ হযরত কাতাদা (রাঃ) বলিয়াছেন, মানুষ তিন প্রকারঃ (১) পূর্ণ মানুষ ঐ ব্যক্তি যে বুদ্ধিমান (২) অর্ধেক মানুষ ঐ ব্যক্তি যাহার বুদ্ধি নাই কিন্তু বুদ্ধিমান লোকের নিকট হইতে পরামর্শ গ্রহণ করে এবং (৩) যাহার মধ্যে কিছুই নাই অর্থাৎ যে ব্যক্তি বুদ্ধিমানও নয় এবং কোন বুদ্ধিমান লোক হইতে পরামর্শও গ্রহণ করে না। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে- আল্লাহ্ তাআলা আকলকে সৃষ্টি করিয়া বলিলেন, পিঠ ফিরাও, সে পিঠ ফিরাইল। আবার বলিলেন, সম্মুখ দিকে ফির, সে সম্মুখ দিকে ফিরিল। অতঃপর আল্লাহ্ তাআলা ফরমাইলেন, আমার ইজ্জত ও জালালের কসম করিয়া বলিতেছি আমি তোমা হইতে সুন্দর নেক এবং ভাল আর

কোন মাখলূক সৃষ্টি করি নাই। সুতরাং যে মাখলূক আমার অত্যধিক প্রিয় তাহার সঙ্গে তোমাকে মিলিত করিব। তোমার কারণে তাহাকে ধরা হইবে অর্থাৎ যাহার আকল আছে তাহার নিকট হইতে হিসাব-নিকাশ নেওয়া হইবে, পাগল হইতে কোন হিসাব-নিকাশ নেওয়া হইবে না। আর তোমার কারণেই লোকদিগকে পুরস্কার দেওয়া হইবে, তোমার কারণেই শাস্তি দেওয়া হইবে, সুতরাং বুদ্ধিমান লোককেই সকলে ভালবাসে এবং পিয়ার করে যদিও সে লোকদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার না করে। আর আল্লাহ্ তাআলা মূর্খতা ও অজ্ঞতাকে সৃষ্টি করিয়া বলিলেন, সম্মুখের দিকে ফির, সে পিছনের দিকে ফিরিল। অতঃপর বলিলেন, পিছনের দিকে ফির, সে সম্মুখের দিকে ফিরিল। তখন আল্লাহ্ তাআলা বলিলেন, আমার ইজ্জত ও জালালের কসম করিয়া বলিতেছি, আমি তোমা হইতে অধিক দুশমন কোন মাখলূক সৃষ্টি করি নাই। আমি তোমাকে ঐ লোকদের সঙ্গে মিলাইব যাহারা আমার নিকট অত্যধিক দুশমন। সুতরাং তুমি দেখিতে পাইবে মূর্খ ও অজ্ঞ লোক সমস্ত মানুষের নিকট দুশমন বলিয়া পরিচিত হইবে যদিও সে লোকদের সঙ্গে খারাপ না করিয়া থাকে। হযরত আয়েশা (রাঃ) নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! কোন্ বস্তুর কারণে মানুষ দুনিয়াতে মর্যাদাশীল হয়? উত্তরে তিনি ফরমাইলেন, আকলের কারণে। তিনি আরও জিজ্ঞাসা করিলেন, আখেরাতে? উত্তর দিলেন, আকলের কারণে।

ইমাম যাহাবী (রহঃ) বলিয়াছেন, طِبِّ نبوى ﷺ তে আছে- নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ ফরমাইয়াছেন, তোমরা লাউ (কদু) খাও, কেননা লাউয়ের দ্বারা আকল বৃদ্ধি পায় এবং জ্বরের রোগীদের জন্য এবং কাশের জন্য খুব উপকারী ঔষধ।

হেকায়েত ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল আল্লাহ্ তাআলার প্রদত্ত জিনিসের মধ্যে কোন্ বস্তু সবচেয়ে উত্তম? উত্তর দিলেন, আকল। পুনরায় জিজ্ঞাসা করা হইল, যদি আকল না থাকে তবে কি বস্তু/ উত্তর দিলেন, ভাল আদব। যদি আদব না থাকে তবে কি? বেশী সময় চুপ থাকা। যদি বেশী সময় চুপ থাকা না হয় তবে কি? সৎ ভাই, তাহার নিকট হইতে পরামর্শ নিবে। যদি সৎ ভাই না থাকে তবে কি? তাড়াতাড়ি মৃত্যু হওয়া ভাল। কোন কোন আলেম বলিয়াছেন, যখন হযরত আদম (আঃ)-কে যমীনে নামাইয়া দেওয়া হয়, তখন জিবরাঈল (আঃ)

দ্বীন, মনুষ্যত্ব এবং আকল হযরত আদম (আঃ)-এর সম্মুখে পেশ করিলেন এবং বলিলেন, এই তিন বস্তু হইতে একটি গ্রহণ করার জন্য আল্লাহ্ তাআলা আপনাকে এখতিয়ার দিয়াছেন। আদম (আঃ) আকলকে পছন্দ করিয়া গ্রহণ করিলেন। তারপর জিবরাঈল (আঃ) দ্বীন এবং মনুষ্যত্বকে বলিলেন, তোমরা উভয়ে উপরে উঠিয়া যাও। তখন তাহারা বলিয়া উঠিল, আল্লাহ্ তাআলার আকল যেখানে থাকে সেখানে তাহাদের সঙ্গে আমাদিগকে থাকিতে হুকুম দিয়াছেন।

জাহেল মূর্খ লোকেরা প্রকৃত মর্যাদাশীল মুর্শিদের প্রতি বিশ্বাস করে না। আর যাহার মুর্শিদের কোন মর্যাদা হাসেল হয় নাই তাহার নিকট মুরীদ হয়। আর যাহারা নামাযের খুব হেফাযত করে এবং শরীআতে মুহাম্মাদীর উপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকে, কিন্তু মূর্খ জাহেলদের প্রবৃত্তির বিপরীত কাজ করার দরুন যেমন বে-নামাযীকে কাফের বলে না এবং তাহার জানাযার নামায পড়ে এবং লোকদিগকে সুললিত ভাষায় ওয়াজ করিয়া দ্বীনের দিকে আহ্বান করে, কাহারো সঙ্গে কঠোর ভাষায় কথা বলে না ও কাহাকেও মারধর করে না এবং কাহারো মাল শরীআতী কারণ ব্যতীত নেয় না, সেই জন্য এই সমস্ত লোকদিগকে মনে করে তাহারা দ্বীনের ব্যাপারে ঢিলা। কিংবা তাহাদের দুই, তিন, চারজন স্ত্রী আছে এই কারণে তাহাদিগকে দরবেশ এবং মুর্শিদ বলিয়া মনে করে না। আর যাহারা নামায পড়ে না, তাহার কার্যাবালী শরীআতের বিপরীত এবং যাহারা বিবাহ-শাদী করে না তাহাদেরকে দরবেশ বলিয়া জানে। অথবা যাহারা শরীআতের উপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত এবং নিজের পরিবার পরিজনের খাওয়া পরার জন্য কোন ব্যবসা ও দোকানদারী করে তাহাদিগকে দরবেশ বলিয়া জানে না। মোটকথা জাহেল ও মূর্খ লোকদের জ্ঞান-বুদ্ধি চাল-চলন সব উল্টা হয়। আর কত বলিব, মূর্খতা নিজের সৃষ্টিকর্তার সম্মুখে তাহার হুকুমের উল্টা কাজ করিল কারণ যখন তাহাকে হুকুম করা হইল পিছন দিক ফির কিন্তু সে সম্মুখের দিকে ফিরিল।

দ্বিতীয় উপদেশঃ এখন ইলমের বর্ণনা শোন। প্রথম ইলমের ফযীলত এবং ইলম অনুযায়ী আমল না করার ক্ষতি ও ইলম শিক্ষা করা এবং শিক্ষা দেওয়ার তাকিদের বর্ণনা করিয়া ইলম কাহাকে বলে তাহার সংজ্ঞা বর্ণনা করিব। এখন ইলমের আদবের কথা শোন, 'নাযহাতুল মাজালিস' কিতাবে আছে আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করিয়াছেন–

قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ

অর্থাৎ- "বল হে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিক্ষিত আর অশিক্ষিত কি সমান হইতে পারে?" (সূরা যুমার ঃ ২৩ পারা)

আল্লাহ্ তাআলা আরও ফরমাইয়াছেন-

اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا

অর্থাৎ- "নিশ্চয় আলেমগণই আল্লাহ্ তাআলাকে ভয় করিয়া থাকেন।" (সূরা ফাতির ঃ ২২ পারা) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

مَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ بِهٖ خَيْرًا يُّفَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ

অর্থাৎ- "আল্লাহ্ তাআলা যাহার মঙ্গল কামনা করেন তাহাকে দ্বীনের ইলম দান করেন"। অর্থাৎ দ্বীন সম্বন্ধে পুরাপুরি জ্ঞান দান করেন। আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ ফরমাইয়াছেন- আল্লাহ্ তাআলার আরশের নীচে খালেছ মেশকের একটি শহর আছে। উহার দরজায় একজন ফেরেশতা আছেন। সেই ফেরেশতা প্রত্যেক দিন ডাকিয়া বলেন, শোন! যে ব্যক্তি আলেমদের সঙ্গে মুলাকাত করিল সে যেন নবীগণের সঙ্গে মুলাকাত করিল, আর যে নবীগণের সঙ্গে মুলাকাত করিল নিশ্চয় সে যেন আল্লাহ্ তাআলার সঙ্গে মুলাকাত করিল, যে আল্লাহ্ তাআলার সঙ্গে মুলাকাত করিল তাহার জন্য বেহেশ্ত (হাদীসে ফেরদাউস)। হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলিয়াছেন, অনেক ইবাদতের চেয়ে সামান্য ইলমও অনেক ভাল। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলিয়াছেন, তোমরা দ্বীনের ইলম শিক্ষা কর কেননা আল্লাহ্ তাআলার জন্য ইলম শিক্ষা করা নেকী এবং উহা অন্বেষণ করা ইবাদত। আর নিজেদের মধ্যে আপসে ইলমের আলোচনা করা তাসবীহ্। ইলমের জন্য বাহাস করা, যুক্তিতর্ক করা জিহাদ করার সমান। যাহার ইলম নাই তাহাকে ইলম শিক্ষা দেওয়া সদকার মত। আর ইলম শিক্ষা দেওয়ার জন্য টাকা পয়সা খরচ করিলে আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের আশা করা যায়, কেননা ইলম হালাল হারাম জানার জন্য নিদর্শন আর বেহেশতী লোকের জন্য রাস্তার স্তম্ভ। হতবুদ্ধির সময় ইলম অন্তরকে মজবূত ও শক্ত করে, মুসাফেরীর সময় সঙ্গী হয়, নির্জনের সময় কথা বার্তার সুযোগ হয়। ইলম খুশী ও লাভের দিকে পথ দেখায় এবং

বিপদাপদ, কষ্ট-তাকলিফ ও দারিদ্রতার সময় সাহায্যকারী হয়। আর শত্রুকে পরাজিত করিবার হাতিয়ার, বন্ধু-বান্ধবের নিকট নিজের সৌন্দর্য প্রকাশকারী। ইলমের দ্বারা আল্লাহ্ তাআলা এক সম্প্রদায়কে সম্মান-মর্যাদার সহিত উচ্চস্তরে পৌঁছাইয়া দেয়। ইলম মানুষকে সত্যের দিকে নিয়া যায় এবং সমাজের নেতা করে, যেন লোকেরা তাহার পদাঙ্কানুসরণ করে ও তাহার কার্যাবলী গ্রহণ করে। আলেমের দ্বারা সমস্ত কাজ কর্মে, মুআমালায়, মাসআলায় তাহার রায়কেই চূড়ান্ত বলিয়া মনে করিবে। ফেরেশতা আলেমের সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখার ইচ্ছা করে এবং নিজের বাহু দিয়া তাহাকে মুছিয়া দেয়, তাহার জন্য সমস্ত জলে-স্থলে এবং সমুদ্রের মৎস্য ও স্থলের চতুস্পদ প্রাণীও আল্লাহ্ তাআলার নিকট মাগফিরাত কামনা করে, কেননা ইলম মৃত আত্মাকে সজীব করে। আর ইলম অন্ধকারের মধ্যে চোখের জ্যোতিস্বরূপ, ইলমের দ্বারা মানুষ মনোনীত স্থানে পৌঁছে এবং দুনিয়া ও আখেরাতে উচ্চ মর্যাদায় পৌঁছতে সক্ষম হয়। ইলমের মধ্যে ধ্যান নিমগ্ন করা রোযার সমান মর্যাদা আর ইলম শিক্ষা দেওয়া সমস্ত রাত্র জাগিয়া ইবাদত করার শামিল ও একে অপরের প্রতি সহানুভূতি হয়। ইলমের দ্বারা হালাল-হারামকে বুঝা যায়। ইলম আমলের ইমাম অর্থাৎ আমল ইলমের অধীনে তাই ইলমের দ্বারা মানুষ ভাল কাজ করে এবং নেক কাজের কারণে ইলম হাসেল হয় ও নেককার লোকদের অন্তরে আল্লাহ্ তাআলা ইলম স্থাপন করেন এবং খারাপ লোকদিগকে ইলম হইতে বঞ্চিত করেন। মুসান্নেফ (রহঃ) বলেন, আমি তাফসীরে রাযী ও তাফসীরে ইবনে মালকান-এর মধ্যে কোন কোন নুসখায় দেখিয়াছি, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ ফরমাইয়াছেন-

كُنْ عَالِمًا اَوْ مُتَعَلِّمًا اَوْ مُسْتَمِعًا اَوْ مُحِبًّا وَلَا تَكُنِ الْخَامِسَ فَتَهْلِكَ -

অর্থাৎ- "তোমরা আলেম হও কিংবা তালেবে-ইলম হও অর্থাৎ ইলম শিক্ষাকারী কিংবা আলেমের কথা ও ওয়াজ শ্রবণকারী হও বা আলেমের সঙ্গে মহব্বত রাখ কিন্তু পঞ্চম হইও না, তবে ধ্বংস হইয়া যাইবে অর্থাৎ জাহান্নামে যাইবে।" এই হাদীসের দ্বারা ইহাই সাব্যস্ত হইল যে, আলেম এবং তালেবে-ইলম (ইলম অন্বেষণকারী) কখনও ধ্বংস হইবে না। যদি আলেম বা তালেবে-ইলম না হয় বরং আলেমের ওয়াজ শ্রবণ করে সেও

ধ্বংস হইবে না। যদি ওয়াজ শ্রবণ করার সুযোগ না হয় কিন্তু আলেমের সঙ্গে মহব্বত রাখে সেও ধ্বংস হইবে না। কিন্তু যে ব্যক্তি পঞ্চম সে ধ্বংস হইয়া যাইবে। পঞ্চম ঐ ব্যক্তি যাহার ওয়াজ শ্রবণ করার সুযোগ থাকার পরও শ্রবণ করে না, কিংবা শ্রবণ করে কিন্তু আলেমের সঙ্গে মহব্বত রাখে না কিংবা ওয়াজও শ্রবণ করে না এবং আলেমের সঙ্গেও মহব্বত রাখে না, সে জাহান্নামী। হযরত নবী কারীম সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ ফরমাইয়াছেন- ইলমের মজলিসে উপস্থিত হওয়া হাজার রাকআত নামায পড়া, হাজার রুগীর সেবা শুশ্রূষা করা হইতে এবং হাজার জানাযার নামাযে শরীক হওয়া হইতে অতি উত্তম। লোকেরা জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! কোরআন শরীফ তিলাওয়াত করা হইতেও কি উত্তম? উত্তর দিলেন, কোরআন শরীফ তিলাওয়াত করার মধ্যে ফায়েদা হয় ইলমের কারণে।

عُيُوْنُ الْمَجَالِسِ কিতাবে আছে হযরত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত জিবরাঈল (আঃ)-কে ইলমের অবস্থা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন। জিবরাঈল (আঃ) বলিলেন, আপনার উম্মতের জন্য ইলম দুনিয়া ও আখেরাতে বাতিস্বরূপ। সুসংবাদ ঐ ব্যক্তির জন্য যে আলেমদের মর্যাদা বুঝিতে পারিয়াছেন এবং তাহাদের সঙ্গে ভালবাসা রাখেন। আর যে ব্যক্তি আলেমদের মর্যাদাকে অস্বীকার করে এবং তাহাদের সঙ্গে দুশমনী রাখে তাহার জন্য ওয়েল অর্থাৎ ভয়ানক আযাব রহিয়াছে (ওয়েল দোযখের একটি উপত্যকা)। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, হযরত সুলায়মান (আঃ)-কে ইলম, মাল এবং রাজত্ব এই তিনটির মধ্যে একটি গ্রহণ করার জন্য অধিকার দেওয়া হইল, সুলায়মান (আঃ) ইলমকে গ্রহণ করিলেন, অতঃপর আল্লাহ্ তাআলা তাহাকে মাল ও রাজত্ব উভয়ই প্রদান করিলেন। হযরত ঈসা (আঃ) উদাহরণ দিয়াছেন, যে ব্যক্তি ইলম শিক্ষা করিল অথচ ইলমের অনুপাতে আমল করে নাই সে এমন স্ত্রী লোকের মত যে গোপনে যিনা করিল ও গর্ভবতী হইয়া গেল এবং পরে তাহার গর্ভের কথা লোক চক্ষে প্রকাশ হইয়া পড়িল, তখন সে যে রূপ অপমানিত হইবে, ঐরূপ যে ব্যক্তি নিজের ইলমের অনুপাতে আমল করে না তাহাকে আল্লাহ্ তাআলা কিয়ামতের দিন অপমানিত করিবেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে হাদীস বর্ণিত আছে- হযরত নবী কারীম সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুআ করিতেন, হে আল্লাহ! যাহারা

দ্বীনের ইলম লোকদিগকে শিক্ষা দেয় এবং ওয়াজ করে তাহাদিগকে ক্ষমা কর। আর তাহাদিগের শরীরে বরকত দান কর এবং তাহাদের হায়াত বৃদ্ধি করিয়া দাও।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে- হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিতেন, হে আল্লাহ! তুমি আমার খলীফা (প্রতিনিধির)-দিগের উপর দুআ ও রহমত দাও, আমার পরে যাহারা আসিবে এবং হাদীস রেওয়ায়েত করিবে ও লোকদিগকে হাদীস শিক্ষা দিবে।

তৃতীয় উপদেশ ঃ মেশকাতে মাসাবীহ্‌র كِتَابُ الْعِلْمِ এর তৃতীয় পরিচ্ছেদে হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে- তিনি বলিয়াছেন, হুজূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বলিলেন, ইলম শিক্ষা কর এবং লোকদিগকে শিক্ষা দাও, তোমরা আহকামে ফারায়েয ও ইলমে ফারায়েয শিক্ষা কর এবং লোকদিগকে শিক্ষা দাও। আর কোরআন শরীফ নিজেরা শিখ ও লোকদিগকে শিক্ষা দাও। কেননা আমিও মানুষ, আমারও মৃত্যু হইবে, অতিসত্বর ইলম উঠিয়া যাইবে এবং ফেতনা-ফাসাদ আরম্ভ হইবে; এমনকি দুই ব্যক্তি একটি ফরয হুকুমের মধ্যে মতভেদ করিবে, নফল সুন্নাতের তো কথাই নাই। সুতরাং এই উভয় ব্যক্তির মধ্যে মীমাংসাকারী খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।

মুখবেরে সাদেক আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মু'জেযা হিসেবে যে সমস্ত বিষয়ের সংবাদ দিয়াছেন উহা সত্যে পরিণত হইতেছে এবং নানা প্রকার ফেতনা-ফাসাদ প্রকাশ পাইতেছে। সুতরাং এই সমস্ত ফেতনা-ফাসাদ রোধকরার একমাত্র চিকিৎসা হইল ইলম শিক্ষা করা এবং শিক্ষা দেওয়া, ওয়াজ শোনা এবং অপরকে শোনান। অতঃপর তাহাদের সম্বন্ধে শোন, তাহাদেরকে হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলেম বলিয়া আখ্যা দিয়েছেন।

চতুর্থ উপদেশ ঃ হযরত শেখ আহমদ ছেরহিন্দী মুজাদ্দেদে আলফেছানী (রহঃ) তাঁহার রচনাবলীর প্রথম খণ্ডে লিখিয়াছেন; হাদীস শরীফে আছে হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন–

اَلْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْاَنْبِيَاءِ

অর্থাৎ- "আলেমগণ নবীদের ওয়ারেছ (উত্তরাধিকারী)" সুতরাং আম্বিয়া (আঃ) হইতে যে ইলম রহিয়া গিয়াছে উহা দুই প্রকার ঃ (১) ইলমে আহকাম এবং (২) ইলমে আছরার বা গোপন ইলম।

এই অধম বলিতেছে, ইলমে আহকাম ফেকাহ, যাহা মানুষের আমলের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে, আর ইলমে আছরার তথা ইলমে তাসাউফ ও আকায়েদ উভয় প্রকার ইলম পুনরায় ইলমে বাতেনের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে। আশআতুল লুমআত-এর মধ্যে হাদীসে জিবারাঈলের শরাহ্-এর মধ্যে এইরূপই বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর হযরত মুজাদ্দেদ (কুঃ রূঃ) সম্মুখের দিকে বলিতেছেন, ওয়ারেছ ঐ ব্যক্তি যে এই উভয় প্রকার ইল্‌মে পারদর্শী। ঐ ব্যক্তি ওয়ারেছ নয় যাহার এক প্রকার ইলম আছে অন্য প্রকার নাই। কেননা সে ওয়ারেছ হওয়ার অনুপযুক্ত এই জন্য যে, ওয়ারেছের জন্য ত্যাজ্য সম্পত্তির পূর্ণ অংশ নির্দিষ্ট থাকা চাই, এখানে তাহা নাই; কোন অংশ মিলিল, কোন অংশ মিলিল না।

এই অধম বলিতেছে, হাদীসের অর্থ ভালরূপে হৃদয়ঙ্গম না করার দরুন এই দেশে বহু ফাসাদের সৃষ্টি হইয়াছে, অনেক লোক ধোকাবাজদের ফাঁদে পড়িয়া পথভ্রষ্ট হইয়াছে। যাহারা ওয়ারেছে আম্বিয়া নয় তাহারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের বিপরীত ভুল কথাবার্তা শুনাইয়া লোকদিগকে পথভ্রষ্ট করিয়াছে এবং নিজেরাও পথভ্রষ্ট হইয়াছে। কেননা যাহাদের উভয় প্রকারের ইলম নাই সে আলেম নয়, আর যে আলেম নয় সে ইলম ছাড়া ফতোয়া দিয়া নিজেরাও গোমরাহ হয় এবং অন্যকেও গোমরাহ করে। এই বিষয় মেশকাত শরীফের كِتَابُ الْعِلْمِ এর প্রথম পরিচ্ছেদে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে। শেষের দিকে আছে فَضَلُّوْا وَاَضَلُّوْا এই প্রকারে যে ওয়ারেছে আম্বিয়া নয় এবং যাহাদের মাশায়েখের মর্যাদা হাসেল হয় নাই, তাহাদের নিকট লোকেরা মুরীদ হইয়া খারাপ হইয়া গিয়াছে এবং তরীকতের নেয়ামত হইতে মাহরূম হইয়াছে। সুতরাং মুসলমানদের প্রধান কর্তব্য অন্তরে একটু ধ্যান করিবে এবং বিচার করিয়া উভয় ধোকাবাজদের রাস্তা হইতে তওবা করিবে। এখন এই দেশে যাহারা আলেম নয়, তবু নিজদিগকে আলেম বলিয়া প্রকাশ করে তাহাদিগকে চিনিয়া রাখ। লা-মাযহাবের লোকেরা আলেম এবং ওয়ারেছে আম্বিয়া নয়। কেননা ইলমে আহকামের মধ্যে ফেকাহ্ একটি অত্যাবশ্যকীয় ইলম, উহাকে তাহারা অস্বীকার করে।

তাহারা খোলাখুলিভাবে লোকদিগকে ফেকাহ্‌র উপর আমল করা হইতে এবং ফেকাহ্‌র ইলম শিক্ষা করা হইতে নিষেধ করে। এই রকমের বাংলাদেশের খারেজী সম্প্রদায় এবং কোন কোন দলের আলেম ওয়ারেছে

আম্বিয়া নয়। কেননা ইলমে আছরার অর্থাৎ তাসাউফকে তাহারা অস্বীকার করে। এই প্রকারে যাহারা নিজেদেরকে সূফী বলে অথচ ইলমে আছরারের সঙ্গে মোটেই পরিচিত নয় আবার লোকদিগকে মুরীদ করে তাহারা জাহেল মূর্খ। আর জাহেলদের নিকট হইতে দূরে থাকা ওয়াজিব, যেমন- আল্লাহ্ তাআলা সূরায়ে আ'রাফের মধ্যে ফরমাইয়াছেন-

وَاَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ

অর্থাৎ, "জাহেলদের নিকট হইতে দূরে থাক।"

তৃতীয় উপকার ঃ ওয়াজকারীগণকে, ফেকাহ্ ও কোরআন শরীফ শিক্ষা দানকারীগণকে এবং ইমাম-মুয়াজ্জিনগণকে যদি কোন ব্যক্তি খুশী হইয়া কিছু হাদিয়া দেয়, তবে উহা গ্রহণ করার দলিল এবং উল্লেখিত লোকগণ যখন জরুরতের জন্য সঙ্গে নিজের খরচ নেয় তখন উহা দুরস্ত হওয়ার দলিল বর্ণনা করার জন্য এই উপকারের মধ্যে চারটি তাম্বীহ্ অর্থাৎ উপদেশ বর্ণনা করা হইবে।

প্রথম উপদেশ ঃ দ্বিতীয় ওয়াজের দ্বিতীয় উপকার আলোচনায় এই কথা ভালরূপেই বুঝিতে পারিয়াছ যে, আল্লাহ্ তাআলার ইবাদতের মধ্যে পরিশ্রম এবং আহকামে শরীআত পালনে পরীক্ষা রহিয়াছে। আর নিজের আদেশাবলী এবং রাসূলের সুন্নাতের আনুকূল্য প্রকাশ করার সঙ্গে সত্য হইতে মিথ্যা এবং মুখলেস হইতে গায়রে মুখলেস বুঝা যাইবে। আর যদি ওয়াজকারীদিগকে খরচ দেওয়া এবং নেওয়া ফেকাহ্ শাস্ত্রের মতে জায়েয হয় তবে মুসলমানদের তাহার সঙ্গে আনুকূল্য প্রকাশ করিয়া সত্য ও মুখলেস হইয়া যাওয়া উচিত, আর তাহার বিরোধিতা করা মিথ্যাবাদী ও গায়রে মুখলেসের কাজ। আল্লাহ্ তাআলার আদেশাবলী এবং তাঁহার রাসূলের সুন্নাতের বর্ণনা ফেকাহর কিতাবে বিদ্যমান আছে। আয়্মায়েশ এবং পরীক্ষা যাহা আমি উম্মতদের জন্য সাব্যস্ত করিলাম, এইরূপ আয়্মায়েশ এবং পরীক্ষার মধ্যে সাহাবায়ে কেরামগণও শরীক আছেন। এই সমস্ত পরীক্ষা হইতে আরও বড় পরীক্ষা সাহাবাদের জন্য ছিল, উহার মধ্যে তাঁহারা সত্যবাদী এবং মুখলেস সাব্যস্ত হইয়াছেন। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ্য যে ঃ

"মাদারেজুন্ নুবুওয়াতে'র পঞ্চম অধ্যায়ে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য যে সমস্ত মর্যাদা এবং কামালিয়াত খাস ছিল উহার

বর্ণনায় লিখিয়াছেন, যে স্ত্রীলোকের স্বামী নাই, যদি হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন মেয়েলোককে বিবাহ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতেন তবে ইহা গ্রহণ করা ঐ স্ত্রীলোকের উপর ওয়াজিব। আর যার স্বামী আছে এমন স্ত্রীলোককে যদি বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হইতেন তখন ঐ স্বামীর নিজ স্ত্রীকে তালাক দেওয়া ওয়াজিব। এখানে ঐ ব্যক্তির ঈমানের পরীক্ষা ছিল।

হযরত সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) এমন বড় বড় এমতেহানে তাঁহারা মুখলেস ও সত্যবাদিতার পরিচয় দিয়াছেন। তাহা হইলে আমরা আহকামে-শরীআত এবং ইবাদতের পরীক্ষায়- যাহা সাহাবাদের পরীক্ষা হইতে অতি সহজ, তাহাতে আমরা মুখলেস ও সত্যবাদী বলিয়া পরিচয় দিতে পারিব না কেন? যাহা হউক এই বিষয় ভালরূপে বুঝে আসার পর ওয়ায়েজগণের নিজ খরচ সাব্যস্ত করার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করা এবং তাহার বিরোধিতা করা, নিজের দ্বীনের মূলকে অস্বীকার করার নামান্তর এবং কাঁচা ও মিথ্যাবাদী, গায়রে মুখলেস মুসলমান হিসেবে পরিচয় হয়। আল্লাহ্ আমাদিগকে এমন কাজ হইতে রক্ষা করুক। সুতরাং উল্লেখিত মুনাফেকদের মিথ্যা অপবাদ ও সন্দেহকে নিরসন করার এবং ওয়ায়েজগণের নিজ খরচ নির্দিষ্ট করিয়া নেওয়া বা নির্দিষ্ট করিয়া না নেওয়া ইত্যাদি জায়েয হওয়া সম্বন্ধে ফেকাহ্ শাস্ত্র দ্বারা সাব্যস্ত আছে। এই বিষয় ফেকাহ্ দ্বারা যতটুকু সাব্যস্ত আছে তাহার বর্ণনা শ্রবণ কর।

দ্বিতীয় উপদেশ ঃ যখন কেহ ওয়ায়েজগণকে সন্তুষ্টচিত্তে কিছু হাদিয়া প্রদান করে, তাহা গ্রহণ করা জায়েয হওয়া সম্বন্ধে দলিল পেশ করা হইতেছেঃ ফতোয়ায়ে আলমগিরী كِتَابُ اَدَابِ الْقَاضِىْ এর নবম অধ্যায়ে লিখিয়াছে, যদি কোন ব্যক্তি ওয়ায়েজগণকে কিছু হাদিয়া দেয় তবে তাহা গ্রহণ করা জায়েয আছে এবং নিজের জন্য নির্দিষ্ট করা অর্থাৎ সমস্ত হাদিয়া নিজে নেওয়াও জায়েয আছে। এই কথার দ্বারা ইহা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, পূর্ব যামানা হইতেই মুসলমানদের মধ্যে ওয়ায়েজদিগকে হাদিয়া দেওয়ার প্রথা ছিল। আর সাধারণতঃ সকলের জন্য হাদিয়া দেওয়া বা নেওয়ার ফায়দা হাদীসে বর্ণনা করা হইয়াছে- 'নাযহাতুল মাজালিস' بَابُ الْكَرَمِ وَالْفتوة دَوْر الإسْلَام এর মধ্যে লিখিয়াছেন- নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ ফরমাইয়াছেন-

এবং তাহার উপর তাহার মুর্শিদ বসা আছে এবং তাহার পেশানিতে মোবারক আল্লাহ্ শব্দ স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। সুতরাং এই রকম মূর্খ মুর্শিদ ত্যাগ করা দরকার এবং তাহার বায়আত হইতে তাওবা করা ও দূরে থাকা ওয়াজিব। বড় পরিতাপের বিষয় কোন কোন শরীফ ব্যক্তি এবং কিছু কিছু শিক্ষিত ব্যক্তিও এই রকম জাহেলের মুরীদ হওয়ার জন্য উড়িয়া যায় এবং এই কথা বলিতে থাকে যে, আমি হযরত শাহ পীর দস্তগীর অমুক শাহের মুরীদ। অথচ লজ্জার বিষয় নামাযের মধ্যে আল্লাহ্ জাল্লা জালালুহুর তাজিমের জায়গায় মুর্শিদের খেয়াল করা গাধা-গরু খেয়াল করার চেয়েও নিকৃষ্ট এবং খারাপ। কেননা গাধা-গরুর খেয়াল হেয় হিসাবে করা হয়। আর মুর্শিদের খেয়াল তাজিমের জন্য করা হয়, আর ইহা সম্পূর্ণ শিরক (অংশীবাদীতা)।

তৃতীয় উপকার ঃ মূর্শিদের মর্যাদার বর্ণনা ঃ এখন মুর্শিদের মর্যাদার বর্ণনা শ্রবণ কর ঃ عَوَارِفُ الْمَعَارِفِ কিতাবের দশম অধ্যায়ে মাশায়েখদের মর্যাদার বর্ণনার শরাহর মধ্যে লিখিয়াছেন তাহার সার সংক্ষিপ্ত আলোচনা "নূরুন আলা নূর" কিতাবে দেখ। তাহার সংক্ষিপ্ত হইল হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ ফরমাইয়াছেন- (কসম ঐ জাতে পাকের যাহার হস্তে আমার জীবন) "তোমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস কর আল্লাহ্র বান্দাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে আল্লাহ্র নিকট প্রিয় যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সঙ্গে তাহার বান্দাদের বন্ধুত্ব করাইয়া দেয় এবং যে মুসলমানদের শুভ কামনা করে ও তাহাদের সাহায্য সহায়তায় জীবন অতিবাহিত করে।" আমি আল্লাহ্র দ্বীনের নসিহত করিয়া ফিরিতেছি এবং তাহার রাসূলের সুন্নাতের ইজ্জত-সম্মান প্রকাশ করিতে এবং আল্লাহ্ তাআলার কিতাবের আহকাম প্রকাশ করিতে আর মুসলমানদের বাদশাহ্ এবং সমস্ত মুসলমানদের দ্বীন হাসেল করার জন্য সংশোধনের চেষ্টা করিতেছি। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন উহাতে মাশায়েখদের মর্যাদার কথাই উল্লেখিত হইয়াছে। আর এই মর্যাদা আল্লাহ্ তাআলার দিকে ডাকার দরুনই হইয়া থাকে, কেননা মুর্শিদ আল্লাহ্র বান্দাদেরকে তাহার সঙ্গে বন্ধুত্ব করাইয়া দেয়। আর এই মর্যাদা মাশায়েখদের মর্যাদা, যাহা সমস্ত মর্যাদার উর্ধ্বে। সূফীদের তরীকায় এই মর্যাদা আল্লাহ্ তাআলার প্রতি আহ্বানের মধ্যে নবুওয়াতের প্রতিনিধিত্ব করা। কিন্তু শেখ আল্লাহ্র বান্দাদেরকে আল্লাহ্র সঙ্গে বন্ধুত্ব করাইয়া দেয়। এই কারণে যে, শেখ তাহার মুরীদকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পায়রবীর রাস্তায় চালায়।

আর যে ব্যক্তি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পূর্ণ পায়রবী করিতে পারিয়াছে সেই আল্লাহ্‌র বন্ধু হইয়াছে। যেমন, আল্লাহ্ তাআলা কোরআন মাজীদে এরশাদ করিয়াছেন–

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ

অর্থাৎ- "বল (হে মুহাম্মাদ) যদি তোমরা আল্লাহ্‌র সহিত ভালবাসা স্থাপন করিতে চাও, তবে আমার অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদিগকে ভালবাসিবেন। (সূরায়ে আলে-ইমরান ঃ ৩ পারা)

এই অধম বলিতেছে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পায়রবীর পদ্ধতির বর্ণনা ফেকাহ্ ও তাসাউফের কিতাবে বিদ্যমান। ইলমে ফেকাহ্ তাহারাত (পবিত্রতা) হইতে আরম্ভ হইয়া মীরাছ (উত্তরাধিকার) পর্যন্ত সমাপ্ত হইয়াছে। আর ইলমে ফেকাহ্‌কে আহ্‌কামে ফেকাহ্‌ও বলা হয়। তাসাউফের মধ্যে দিলের অবস্থার বর্ণনা হয়; তাহাকে ইলমে আছরারও বলা হয়। আর এই উভয় প্রকার ইলম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মীরাছ। সুতরাং যে উভয় ইলমে পরিপক্ক সে নবীর ওয়ারেছ এবং তিনিই প্রকৃত আলেম। আর তাসাউফ ও ফেকাহ্‌র অন্তর্গত যাহা "উসূলে ইলমে ফেকাহ্" উহা মূলে উসূলে ইলমে তাসাউফ। আর শরহে হাদীস, তাফসীর এবং আকায়েদ ইহাও ফেকাহ্‌র মধ্যে গণ্য। সুতরাং এই দেশে লা মাযহাবীরা ফেকাহ্ ও তাসাউফের উপর আমল করিতে নিষেধ করিতেছে। উহা আসলে সুন্নাতের পায়রবী এবং বান্দাদেরকে আল্লাহ্‌র নিকট প্রিয় পাত্র হওয়া হইতে বাধা প্রদান করা। পুনরায় এই ধোকাবাজ লোকেরা মানুষদিগকে মুরীদও করিতেছে। সুতরাং তাহারা মিথ্যাবাদী। যাহারা বেদআত, শিরক্ এবং কাফেরের রছমের মধ্যে আবদ্ধ। যেমন আমি এই ওয়াজের দ্বিতীয় উপকারের মধ্যে বর্ণনা করিয়াছি। আর যাহারা দ্বীনের মধ্যে আমীন (বিশ্বাসী) বলিয়া গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না। যাহা আমি এই ওয়াজের চতুর্থ উপকারে বর্ণনা করিব। তাহারা এবং এই লা-মাযহাবী- উভয়ই কৃত্রিম মুর্শিদ। যাহারা তাহাদের নিকট মুরীদ হইয়াছে তাহাদের এই রকম মুর্শিদের নিকট হইতে দূরে থাকা ওয়াজিব। কেননা তাহারা জাহেল মূর্খ। তাহাদের হইতে দূরে থাকার বর্ণনা আমি এই ওয়াজের দ্বিতীয় উপকারে দলিল স্বরূপ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ আয়াত দ্বারা প্রমাণ করিয়াছি। আল্লাহ্ তাআলা সমস্ত মুসলমানকে তাওফীক দিন যেন তাহারা সত্য মুর্শিদ খোঁজ করিয়া ও সত্য পরিচয় লাভ করিয়া মুরীদ হইতে পারে আর হিন্দুদের চাল-চলন হইতে

বাঁচিতে পারে। যেমন হিন্দুরা ব্রাহ্মণদিগকে নিজেদের গুরু বানাইয়া লয়, তাহারা ভাল-মন্দ অন্বেষণ করে না; এইরূপ মুসলমানরা যেন না করে। বরং মুর্শিদের এই তিন রকমের ফায়েয নিবার নিয়ত করিবে এবং এই কথার আবেদন করিবে। আর আমার মুরীদগণও আমাকে পরীক্ষা করিবে এবং এই প্রকারের প্রভাব দেখিবে। আর শেখ আল্লাহ্র বান্দাদিগকে তাঁহার সঙ্গে বন্ধুত্ব করাইয়া অর্থাৎ বান্দাদিগকে আল্লাহ্র আশেক বানাইয়া দেয়। ইহার কারণ শেখ নিজের মুরীদকে পবিত্র করার রাস্তায় চালায়। যখন বান্দার নফস পবিত্র হইয়া যায় তখন তাহার অন্তর আয়নার মত পরিষ্কার হইয়া যায় এবং আজমতে ইলাহির আলোর প্রতিবিম্ব তাহার উপরে পড়ে, তাওহীদের সৌন্দর্য তাহার মধ্যে প্রকাশ পায় এবং তাহার মুশাহাদা ও হক্কুল ইয়াকীন লাভ হয়। তখন বান্দা অনিচ্ছাকৃতভাবেই নিজের প্রতিপালকের সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখে। আর যখন আল্লাহ্ তাআলার দিকে মুতাওজ্জাহ হইবার যোগ্যতা লাভ হয় তখন আল্লাহ্ তাআলার সঙ্গে তাহার একটি সম্বন্ধ স্থাপন হইয়া যায়। আর এই সম্বন্ধ হওয়া নফসে নাতেকার সিফাত যাহা কখনও পৃথক হয় না। যেমন- দেখাশোনা ইত্যাদি। তখন ঐ যোগ্যতাকে বাছীরত বলা হয়। যেমন- চক্ষের দৃষ্টিশক্তি। আর ঐ যোগ্যতাকে নেছবত বলা হয়। আর এই মেহনতকে নফসে তাযকিয়ার (পবিত্র আত্মা) মীরাছ বলা হয়, যেমন- আল্লাহ্ তাআলা সূরায়ে শামস-এর মধ্যে এরশাদ ফরমাইয়াছে–

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا (৩০ পারা) অর্থাৎ- "সমস্ত আকাঙ্ক্ষিত বস্তুকে পাইয়াছে এবং সমস্ত খারাপ বস্তু হইতে নাজাত পাইয়াছে ঐ ব্যক্তি, যে নিজের আত্মাকে কুফরী এবং গুনাহ্ হইতে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে।" নাজাত এবং কামিয়াবী আল্লাহ্র মারেফাত হাসেলের দ্বারা হয়। আর ইহাও আছে যখন দিলের আয়নার আলো আলোকিত হইয়া যায় তখন দুনিয়ার হাকীকত ও মাহিয়াত সবই প্রকাশ হইয়া যায় ও আখেরাতেও প্রকাশ হইয়া পড়ে এবং তাহার সীমা ও তাহার অবস্থা সবই প্রকাশ হইয়া যায়। তখন তাহার বাছীরতের উপর হাকীকতে দ্বীন খুলিয়া যায় ও দুই মঞ্জিল হাসেল হইয়া যায় এবং বান্দা-বাক্বীর (চিরস্থায়ী বস্তু) প্রতি মহব্বত রাখে ও অনীহা প্রকাশ করে অস্থায়ী বস্তুর প্রতি। তখন নফসে যাকিয়ার (পবিত্র আত্মার) উপকার এবং মুর্শিদের দান ও তাঁহার তালীম তরবিয়াত প্রকাশ পায়। মুর্শিদ আল্লাহ্ তাআলার সৈন্যদের মধ্যে একজন। আল্লাহ্ তাআলা মুর্শিদের ওছীলায় মানুষকে সরল-সোজা পথ প্রদর্শন করেন এবং তালেবদিগকে মুর্শিদের ওছীলায় হেদায়েত করেন।

এই আলোচনার দ্বারা ইহাই পরিষ্কার বুঝা গেল যে, আল্লাহ্ তাআলার নিয়ম নিজ বান্দাদিগকে মুর্শিদের ওছীলায় হেদায়েত দান করেন। আর যাহাকে আল্লাহ্ তাআলা পথভ্রষ্ট করিতে ইচ্ছা করেন তাহার জন্য কোন মুর্শিদ মিলে না। যেমন, আল্লাহ্ তাআলা কালামে পাকে এরশাদ করিয়াছেন—

وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَلَهٗ وَلِيًّا مُّرْشِدًا

অর্থাৎ- "যাহাকে পথভ্রষ্ট করা হইয়াছে তাহার জন্য আপনি কোন বন্ধু এবং পথ-প্রদর্শনকারী পাইবেন না।" (সূরায়ে কাহাফঃ ১৫ পারা) এই কথার দ্বারা ইহাই প্রমাণ হইল যে, মুর্শিদ আল্লাহ্র সৈন্যদের মধ্যে একজন; কাজেই প্রত্যেক মুসলমানের উচিত যাহার মধ্যে মুর্শিদের সিফাত পাওয়া যাইবে, তাহার সঙ্গে কোন প্রকার শত্রুতা পোষণ না করা। আর এই হাদীসকে খুব মনে রাখিবে যাহা মেশকাতে মাসাবীহ্র بَابُ ذِكْرِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالتَّقَرُّبُ اِلَيْهِ এর প্রথম পরিচ্ছেদে হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, আল্লাহ্ তাআলা ফরমাইয়াছেন- যে ব্যক্তি আমার দোস্তদের মধ্য হইতে কাহারো সঙ্গে শত্রুতা রাখে তাহার সঙ্গে আমি যুদ্ধ ঘোষণা করিতেছি। আর ইহাও ভালরূপে বোধগম্য হইল যে, মুর্শিদের দ্বারা এই নেয়ামত পাওয়া যায়। মুরীদ আল্লাহ্র আশেক হইয়া যায় এবং মুরীদ আল্লাহ্ জাল্লা জালালুহুর প্রিয়পাত্র হইয়া যায়- ইহার চেয়ে উৎকৃষ্ট নেয়ামত আর কি হইতে পারে।

চতুর্থ উপকার ঃ এখানে মুর্শিদ ধরিবার ইচ্ছা করিলে মুরীদের কর্তব্য হইল মুরীদ হওয়ার পর মুর্শিদ নিজের মুরীদকে যে বিষয় তালীম দেওয়া জরুরী উহার বর্ণনা করা হইবে। শেখ আবুন নাজিব সোহরাওয়ার্দী যিনি عَوَارِفُ الْمَعَارِفِ এর লেখক তিনি নিজের রিসালায় বলিয়াছেন- এই পরিচ্ছেদে সূফীদের আদবের বর্ণনা করা হইবে। প্রথমত ঃ মুরীদ নিজের গাফলতির নিদ্রা হইতে জাগিবার জন্য প্রস্তুত হইবে। সাবধান হওয়ার পর কোন একজন মুর্শিদের নিকট বায়আত হওয়ার ইচ্ছা করিবে। আর মুর্শিদ তাহার জামানার সমস্ত লোকদের মধ্যে দ্বীনের দিক হইতে আমীন (বিশ্বাসী) বলিয়া প্রমাণিত হইতে হইবে এবং আমানতের মধ্যে, শুভাকাঙ্ক্ষী হওয়ার মধ্যে প্রসিদ্ধ হইতে হইবে ও তরীকার মধ্যে আরেফ বিল্লাহ্ হইবে অর্থাৎ ছুলূকের রাস্তা জানা থাকিবে। ছুলূকের অর্থ অভিধানে রাস্তা চলা আর সূফীদের পরিভাষায় আল্লাহ জাল্লা জালালুহুর মহব্বতের রাস্তায় চলা অর্থাৎ ছালেক এমন রাস্তায় চলিবে যাহাতে আল্লাহ্র আশেক হইতে পারে এবং

আল্লাহ্ তাআলার প্রিয়পাত্র হইয়া যাইবে। যেমন মাশায়েখের মর্যাদার বর্ণনায় জ্ঞাত হইয়াছে।

এই অধম বলিতেছে, উপরোল্লেখিত সিফাতসমূহ ঐ মুর্শিদের মধ্যে থাকিতে হইবে যিনি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের হইবে এবং চার হক মাযহাব- হানাফী, মালেকী, শাফেয়ী, হাম্বলী এর কোন এক মাযহাবের অনুসারী হইতে হইবে এবং ওয়ারেছে আম্বিয়া অর্থাৎ ইলমে আহ্কাম ও ইলমে আছরারে অর্থাৎ ইলমে ফেকাহ্ ও ইলমে তাসাউফে পরিপক্ক হইতে হইবে। আর মাশায়েখের মর্যাদায় আমি চতুর্থ ওয়াজের তৃতীয় উপকারে বর্ণনা করিয়াছি। প্রকাশ থাকে যে, যদি সে ফেকাহ্র মাসআলা সম্বন্ধে জ্ঞাত না থাকে তবে সে মুরীদকে শরীআতে মুহাম্মাদীর আহকাম কি প্রকারে শিক্ষা দিবে? মুরীদের নফসের পবিত্রতা শরীআতের তাবেদারী ছাড়া সম্ভব নয়। আবার পবিত্রতা ব্যতীত মারেফাত হাসেল এবং আল্লাহ্র আশেক হওয়া অসম্ভব। আর যদি তাসাউফ সম্বন্ধে ইলম না থাকে তবে মুশাহাদা ও বাতেনী শান্তি হাসেল হওয়া, নীচ কাজ হইতে দূরে থাকা এবং প্রশংসিত রাস্তায় কিভাবে তালীম করিবে। কাজেই যাহার এই উভয় প্রকার ইলম হাসেল নাই তাহার মুর্শিদ হওয়া কখনও জায়েয নাই। আর যত প্রকার ফেতনা ফাসাদ এই দেশে প্রসারিত হইয়াছে তাহা এই মূর্খেরা মুর্শিদ সাজিবার কারণে হইয়াছে। হ্যাঁ যে ব্যক্তি পাঠ্য কিতাবাদী পড়ে নাই কিন্তু অনেক দিন পর্যন্ত কোন পরহেযগার মুত্তাকী আলেমের সংসর্গে থাকিয়া উভয় প্রকার ইলম এবং মাসায়েল পরিজ্ঞাত হইয়াছে এইরূপ লোক মুর্শিদ হইতে পারে। এই বিষয়ে বাকী কথা 'ক্বাউলুল জামিল' কিতাবে দেখ। সুতরাং যদি এই প্রকার মুর্শিদ পাওয়া যায় তাহা হইলে তাহার খেদমতের জন্য নিজকে নিয়োজিত করিতে পার এবং বিশ্বাস রাখিবে যেন তাহার বিরোধিতা না করে। তাহার অবস্থা সততার অর্থাৎ মুর্শিদের সঙ্গে, আল্লাহ্ তাআলার সঙ্গে এবং সৃষ্ট জীবের সঙ্গে সদভাব হইয়া যাইবে, বানোয়াটি করিবে না। তারপর মুর্শিদের কর্তব্য হইয়া যাইবে যে মুরীদকে আল্লাহ্ তাআলার দিকে রুজু করিবার অবস্থা বুঝাইবে এবং তরীকায় চলিবার পথ মুরীদকে শিক্ষা দিবে। মুরীদকে শরীআতে ইসলাম অর্থাৎ ফেকাহ্র মাসায়েল যাহার মধ্যে মুরীদের উপকার ও অপকার প্রকাশ আছে এমন বিষয় শিক্ষা দিবে। অর্থাৎ যে কথার হুকুম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দিয়াছেন তাহার মধ্যে মু'মিনের উপকার নিহিত রহিয়াছে। সুতরাং উহা গ্রহণ করিবে এবং শক্ত করিয়া আকড়াইয়া ধরিবে। আর যে কথা নিষেধ করিয়াছেন উহার মধ্যে মু'মিনের অপকার নিহিত আছে, উহা

ত্যাগ করার তালীম দিবে, তাহাতে মুরীদ রোযা, নামায ইত্যাদি আহকাম পালন করিতে মজবুত হইবে। আর সুদ খাওয়া, নেশার বস্তু খাওয়া, ঢোল বাজান ইত্যাদি গর্হিত কাজ ছাড়িয়া দিবে। এই সমস্ত বিষয়ের বর্ণনা ফেকাহ্‌র কিতাবে বিস্তারিত বর্ণিত আছে। এখন সাধারণ ফেকাহ্‌র মাসআলা বর্ণনা করার পর আরো কিছু বিষয় তালীম দেওয়ার কথা বিশেষ করিয়া এই রিসালায় বর্ণনা করিব। ফেকাহ্‌র মাসআলার মধ্যে প্রথমতঃ মুরীদকে খাওয়ার, পান করিবার এবং পরিধানের জিনিসের মধ্যে হারাম হইতে পরিষ্কার থাকিবার তালীম দিবে। কেননা খানা-পিনা ও পোশাক-পরিচ্ছদ পরিষ্কার করিবার মধ্যে মুরীদ নিজের অবস্থার মধ্যে বেশ বাড়াবাড়ি করে অর্থাৎ দিন দিন তাহার অবস্থা ভাল হইয়া যায়। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন- "হালাল রুযী অন্বেষণ করা ফরযের মধ্যে এক ফরয," অর্থাৎ নামায-রোযা, হজ্জ্ব, যাকাত ইত্যাদি ফরযের পর এক ফরয। আর কোন কোন সূফী মত প্রকাশ করিয়াছেন, হালাল অন্বেষণ করা এবং হারাম ত্যাগ করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয। কিন্তু প্রয়োজন পরিমাণ অর্থাৎ মোবাহ জিনিসের মধ্যেও প্রয়োজনের অতিরিক্তের মধ্যে ডুবিয়া থাকিবে না। ইহার দরুন অনেক ভাল কাজ হইতে মাহরূম থাকিবে। যেমন এমন পরিমাণ খাইবে না যাহাতে তাহাজ্জুদ নামায পড়িতে না পারে। এই প্রকারে প্রত্যেক হালাল কাজের মধ্যে প্রয়োজনের উপর সন্তুষ্ট থাকিবে। অতঃপর যে সমস্ত ফরয নষ্ট হইয়া গিয়াছে তাহার কাযা করিবার তালীম দিবে অর্থাৎ মুরীদের যতগুলি ফরয ছুটিয়া গিয়াছে তাহা উম্‌রী কাযা করার তালীম দিবে। অতঃপর জুলুম করিয়া যে সমস্ত জিনিস নেওয়া হইয়াছে তাহা যার যে হক প্রত্যেককে ফেরত দেওয়ার জন্য অর্থাৎ মাল-আসবাব-যমীন যাহা শরীআতের কারণ ছাড়া নেওয়া হইয়াছে কিংবা চুরি করিয়া, জোর-জবরদস্তি করিয়া বা মিথ্যা মামলা করিয়া নেওয়া হইয়াছে সমস্তই তাহার মালিককে ফেরত দিবে। যেমন হযরত রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন- যে ব্যক্তি হারাম উপায়ে নেওয়া একটি দানা তাহার মালিককে ফেরত দিবে ইহা আল্লাহ্‌র নিকট ৭০টি হজ্জের সমান। আর মানুষের হকের মধ্যে যদি কোন হক বাকী থাকে যেমন কাহাকেও মারিল কিংবা কাহারও কোন অঙ্গ কাটিয়া ফেলিল কিংবা কাহাকেও যখম করিল তাহা হইলে ইহার প্রতিশোধ লইতে দিবে অর্থাৎ অত্যাচারিত তাহাকে মারিয়া, অঙ্গ কাটিয়া কিংবা যখম করিয়া তাহার বদলা নিবে। আরো কোন হক বাকী থাকিলে যেমন কাহারো গীবত করা

হইলে, কাহারো চোগলখুরী করা হইলে কিংবা কাহাকেও গালি দিয়া থাকিলে, তাহার নিকট হইতে মাফ চাহিয়া নিবে এবং তাহার জন্য দুআয়ে এস্তেগ্ফার করিবে। অতঃপর মুরীদকে নফসের মা'রেফাতের তালীম করিবে অর্থাৎ নফসকে জানা এবং নফসের আদব শিক্ষা দিবে আর নফসের জন্য দুইটি সিফাত আছে এক শাহ্ওয়াত (প্রবৃত্তি) অর্থাৎ নফসের খাহেশের মধ্যে চেষ্টা করা ও বাড়াবাড়ি করা আর অনুগত হইতে বিরত থাকা।

এই অধম বলিতেছে, এই উভয় সিফাত মুর্শিদ মুরীদকে বুঝাইবার পর নফসের মা'রেফাতের তালীম করিবে। সুতরাং মুরীদ নফসকে অনুগত করিবে, তাহার সহিত মুজাহাদা ও যুদ্ধ করিয়া। নফসের সঙ্গে মুজাহাদার অর্থ- নফস যে জিনিসে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে উহা হইতে তাহাকে বিরত রাখা। নফসকে তাহার প্রবৃত্তির বিপরীত উত্তেজিত করিবে। যেমন, তাহাজ্জুদের নামাযের জন্য জাগ্রত হওয়া, যাকাত দেওয়া, নেক কাজের দিকে নফসকে প্রেরণা দেওয়া, অলসতা করিতে না দেওয়া এবং তাহার খাহেশের যে সমস্ত বস্তু তাহার জন্য ক্ষতিকর উহা হইতে বিরত রাখা। নফস্‌কে শক্ত হাতে ধরিবে। আর নফসকে লজ্জিত করিয়া এবং দমাইয়া রাখিয়া তাহার উপর জয়ী থাকিবে এবং কড়া কড়া জিনিস পান করাইবে অর্থাৎ নফস যখন নিজের খাহেশের তাড়নায় সুস্বাদু জিনিস খাইতে চাহিবে এবং হারাম ও অপব্যয়ের ভয় করিবে না তখন তাহাকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য খুব কড়া কড়া জিনিস খাইতে দিবে এবং অজিফা অত্যধিক পড়িতে থাকিবে অর্থাৎ মুর্শিদ বেশী পরিমাণে মুরীদকে অজিফার মধ্যে ডুবিয়া থাকার শিক্ষা দিবে। অজিফা চার প্রকার ঃ নামায, কোরআন শরীফ তিলাওয়াত করা, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর দুরূদ শরীফ পড়া এবং ঐ সমস্ত যিকির গ্রহণ করা যাহা হাদীসে বর্ণনা করা হইয়াছে এবং যাহার ফযীলতের বর্ণনাও হাদীসে আছে।

এই অধম বলিতেছে, হযরত সূফীদের তরীকার মধ্যে যে সমস্ত যিকিরের তরীকা নির্দিষ্ট আছে উহা সবই হাদীসের মুওয়াফেক। যেমন, এই ওয়াজের উপকারের মধ্যে জ্ঞাত হইবে ইনশাআল্লাহ্। আল্লাহ্ তাআলার নিকট দুআ করা আর দুআয়ে মাছনূন পড়া। দুআ ইবাদতের মগজ এবং তাফাক্কুর অর্থাৎ মুরাকাবা ও ধ্যান করা, উহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ 'আইনুল ইলম'-এর প্রথম অধ্যায়ের মধ্যে দেখিতে পাইবে। মুরাকাবা হইতে মুশাহাদা হাসেল হয় এবং মুশাহাদাই শেষ অবস্থা।

দেলের মুআমালাকে আহ্ওয়াল বলে। সুতরাং মুশাহাদা দেলের অবস্থা। আহ্ওয়ালের বর্ণনার পরিচ্ছেদে আবুন নাজিব সোহরাওয়ার্দী (আল্লাহ তাঁহার

আত্মাকে পবিত্র করুক) তাঁহার রিসালার মধ্যে লিখিয়াছেন, তামানিয়ার পরে ইয়াকীন এবং উহাই তাসদীক অর্থাৎ সন্দেহ দূরীভূত হওয়ার পরের অবস্থা। তারপর মুশাহাদা, উহা ইয়াকীন দ্বারা দেখা ও চক্ষের দেখার মধ্যবর্তী অবস্থা যেমন আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন- তুমি আল্লাহ্‌র ইবাদত কর এই ভাবে, যেন তুমি আল্লাহ্ তাআলাকে দেখিতেছ, যদিও তুমি তাঁহাকে দেখিতেছ না; তবে ইহা জানিয়া রাখ তিনি তোমাকে দেখিতেছেন আর ইহা মুশাহাদার অবস্থার একেবারে শেষ অবস্থা।

আর সর্বদা নফল রোযা রাখার ও নফল নামায পড়ার এবং শরীআতের বিরোধিতা হইতে বিরত থাকা এবং খারাপ অভ্যাস হইতে নফসকে বিরত রাখা ইত্যাদির জন্য ছালেক চেষ্টা করিবে এবং নিদ্রার পরিবর্তে নফসকে জাগ্রত রাখিবে। আর পেট ভরিয়া খাওয়া হইতে নফসকে কিছু ক্ষুধার্ত রাখিবে এবং স্বচ্ছলতার পরিবর্তে অভাবের মধ্যে রাখিবে। এই ভাবে নফসের সঙ্গে মুজাহাদা করিয়া নিজের অনুগত করিবে, তখন ছালেক সমস্ত তওবাকারীদের মধ্যে একজন তওবাকারী হইয়া যাইবে- এমন তওবাকারী যাহাকে আল্লাহ্ তাআলা ভালবাসেন। যেমন আল্লাহ্ তাআলা পাক কালামে ফরমাইয়াছেন-

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ -

অর্থাৎ- "আল্লাহ্ তাআলা তওবাকারীদেরকে ভালবাসেন এবং পবিত্রতাকারীদেরকেও ভালবাসেন।" (সূরায়ে বাকারাহ ঃ ২য় পারা)

আর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন, اَلشَّابُّ التَّائِبُ حَبِيْبُ اللّٰهِ "তওবাকারী যুবক আল্লাহ্‌র দোস্ত"।

আর ছালেক ঐ লোকদের অন্তর্ভূক্ত হইবে যাহাদের গুনাহ্‌কে আল্লাহ্ তাআলা নেকীর দ্বারা পরিবর্তন করিয়া দেয়। আর আল্লাহ্ তাআলা পাক কালামে এরশাদ করিয়াছেন-

فَاغْفِرْ لِلَّذِيْنَ تَابُوْا وَاتَّبَعُوْا سَبِيْلَكَ -

অর্থাৎ- "সুতরাং ক্ষমা কর ঐ সমস্ত লোকদিগকে যাহারা তওবা করে এবং তোমার অনুসরণ করে।" (সূরায়ে মু'মিনঃ ২৪ পারা)

সুতরাং ঐ ছালেকদের মর্যাদা অনেক বৃদ্ধি পায়। তখন আরশ বহনকারী ফেরেশতারাও তাহাদের জন্য দুআ করে। কারণ আল্লাহ্ তাআলা উক্ত ফেরেশতাদের জন্য তাহা নির্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন।

জাহেল মূর্খ লোকেরা মনে করে سُلُوْك করিলে দ্বিতীয় প্রকারের নেয়ামত লাভ হয়, ঐ নেয়ামতের নাম খোদ ছালেকও জানে না এবং কোন হাকীকতও নাই, সুতরাং ইহা মূর্খতা ব্যতীত আর কিছু নয়। আর সমস্ত মু'মিনের জন্য তওবা করা ফরয। যেমন আল্লাহ্ পাক কোরআন মাজীদে এরশাদ ফরমাইয়াছেন–

وَتُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُوْنَ۔

অর্থাৎ "হে মু'মিনগণ তোমরা আল্লাহ্র দিকে তওবা কর।" (সূরায়ে নূরঃ ১৮ পারা) আল্লাহ্ তাআলা আরো বলেন-

وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ۔

অর্থাৎ- "যাহারা তওবা করে নাই তাহারা যালেম।" (সূরায়ে হুজরাত ঃ ২৬ পারা) কোন কোন মাশায়েখ বলিয়াছেন, যে গুনাহ্ তুমি করিয়াছ সেই গুনাহ্ হইতে তওবা করার ব্যাপারে গাফলতী করা আরো গুনাহ্। আর যে ব্যক্তি তওবা করার পূর্বে মারা গিয়াছে তাহার মুআমালা আল্লাহ্র সঙ্গে। যেমন, আল্লাহ্ পাক ফরমাইয়াছেন–

وَاِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلٰى ظُلْمِهِمْ

অর্থাৎ- "নিশ্চয় আপনার প্রভূ ক্ষমাকারী মানুষের জন্য তাহাদের জুলুমের উপর।" (সূরায়ে রা'দ ঃ ১৩ পারা) আর যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষের রূহ তাহার গলদেশ পর্যন্ত না পৌঁছে কিংবা যতক্ষণ পর্যন্ত তওবার দরজা বন্ধ না হইবে ততক্ষণ পর্যন্ত তওবা করার সময় থাকে। যেমন আল্লাহ্ পাক ফরমাইয়াছেন-

يَوْمَ يَاْتِىْ بَعْضُ اٰيٰتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا اِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ اٰمَنَتْ مِنْ قَبْلُ اَوْ كَسَبَتْ فِىْٓ اِيْمَانِهَا خَيْرًا ۔

অর্থাৎ- "যেদিন তোমার প্রভূ পরওয়ারদেগারের কোন নিদর্শন আসিবে, কোন ব্যক্তির ঈমান কোন কাজে আসিবে না। তোমরা তৎপূর্বে ঈমান আনয়ন কর নাই কিংবা তোমাদের ঈমান কোন ভাল করিতে সক্ষম হয় নাই।" (সূরায়ে আনআম ঃ ৮ পারা) অতঃপর ছালেক তওবা করার পর নিজের উপর জরুরী মনে করিয়া নিবে। আর এই কথা ভালরূপে জানিবে যে, আল্লাহ্ তাআলা তাহার সমস্ত কিছুর হিসাব নিবেন। যেমন আল্লাহ পাক কালামে মাজীদে ফরমাইয়াছেন–

وَاِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَابِهَا وَكَفٰى بِنَا حَاسِبِيْنَ -

অর্থাৎ- "যদি এক সরিষা পরিমাণও মানুষের নেক থাকে তাও তাহাকে দেখান হইবে, আমিই হিসাব নেওয়ার জন্য যথেষ্ট।" (সূরায়ে আম্বিয়া ঃ ১৭ পারা)

অতঃপর যখন তওবার মাকাম তাহার জন্য সহীহ হইয়া যাইবে অর্থাৎ তাহার উভয় মাকাম হাসেল হইবে। তখন যোহদ আরম্ভ করিবে অর্থাৎ দুনিয়ার প্রতি মনের বিতৃষ্ণাভাব প্রদর্শন করিবে। তখন নিশ্চয়ই মুর্শিদের খলিফা হইতে এবং মুর্শিদ হইতে খেলাফত নেওয়ার জন্য এবং খেরকা পরিবার অর্থাৎ মুর্শিদের খলিফা হইবার এবং খেলাফত নিবার সময় আসিয়াছে। যদি খেলাফতের ইচ্ছা করে তবে উহাকে হেফাযত করিবে যাহা খেরকা পরিবার মধ্যে তাহার জন্য জরুরী ও ওয়াজিব হইয়াছে। যাহাতে নালায়েক ও কমিনা না হয় এবং খুটা যেন বাহির না হয়। আর খেরকা পরিবার সময় যে কায়দা নির্দিষ্ট আছে উহা করিয়া থাকিবে। আর খেরকা পরিধানকারী ও অন্যদের মধ্যে পার্থক্য থাকিতে হইবে।

এখন লোকেরা ইনসাফের সঙ্গে চিন্তা করিবে, মুরীদগণ এবং ফকিরগণও যেমন মুর্শিদ খোঁজ করিয়া বায়আত করিবার জন্য লিখিয়াছি, সেরূপ সে মুর্শিদ তালাশ করিয়া মুরীদ হইয়াছে কি না সেদিকে লক্ষ্য রাখিবে। আর মুর্শিদের প্রতি যেরূপ এ'তেকাদ রাখা এবং নিজকে তাঁহার খেদমতে যে ভাবে সোপর্দ করা দরকার এবং صِدْق সেদকের হালাত যেরূপ হওয়া দরকার সেইরূপ সে করিয়াছে কি-না এবং অতঃপর যে সমস্ত বিষয়ে তালীম করার জন্য মুর্শিদকে লিখিয়াছি সেইরূপ মুর্শিদ করিয়াছে কি-না তৎপ্রতিও লক্ষ্য রাখিবে। বিশ্বাস আছে যে যখন কোন মু'মিন খালেস ইনসাফ ও এখলাসের সহিত এই কথা চিন্তা করিবে- যদি উল্লেখিত ছুলূকের মুওয়াফেক তাহার বায়আত করা এবং ছুলূক করা হইয়া থাকে তবে পূর্ণ শোকর করিবে। আর যদি ঐ রকম না হইয়া থাকে তবে কাঁদিবে। এইরূপ হাসি-বিদ্রুপের মত হওয়ার জন্য বড় আফছোছ। যে লোকদের হাল এবং মাকাম সম্বন্ধে কোন কিছু জানা নাই বরং উহার নাম ও অর্থ পর্যন্ত জানা নাই এবং ঐ সমস্ত বিষয় হইতে সে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত তবুও গর্ব করিয়া গরীব লোকদেরকে মুরীদ করে ইহা মূর্খতা। আর ঐ মুরীদগণ সত্য মুর্শিদের বায়আত হইতে ও বরকত হইতে মাহরূম থাকিবে। ইহাকে

কেহ খারাপ মনে না করিয়া নিজের দ্বীনের কাজ হাসেল করিয়া নিবে এবং পুনরায় সত্যভাবে বায়আত হইবে।

দ্বীন প্রচার করার প্রয়োজন মনে করিয়া এমন কোন ব্যক্তিকে ইহার উপযুক্ত মনে করিয়াছি যে হিন্দি ভাষায় কিতাব পড়িতে পারে ও দ্বীনের ব্যবস্থার খুব মজবুত এবং লোকদিগকে দ্বীনের কথাবার্তা শিক্ষা দিতে পারে এমন ব্যক্তিকে খলিফা করিব। বুঝিতে পারিলাম এমন ব্যক্তি যাহার দ্বারা চেষ্টা করার পরও কোন কোন হরফ আদায় হয় না সে ব্যক্তি মা'যূর (যাহার কোন ওযর আছে), তাহার নামায পড়া জায়েয হইবে কিন্তু ইমামতি জায়েয হইবে না। কিন্তু যাহারা তাহার মত তাহাদের ইমামতি জায়েয আছে যেমন ফতোয়ায়ে আলমগীরীতে باب زلة القارى এর মধ্যে লেখা আছে। কিন্তু তারপরেও মনের মধ্যে কিছু সন্দেহ থাকিয়া গেল যে, এমন মানুষকে খলিফা বানানোর ফলে শরীআতের খেলাফ না হয়।

সুতরাং اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য হযরত মুজাদ্দেদে আলফে ছানী (রহঃ)-এর লেখার পর ঐ সন্দেহ দূরীভূত হইল। আর ঐ উল্লেখিত খলিফা আমার কাসেদ ও দূত নিযুক্ত হইল। হযরত মুজাদ্দেদ মামদুহ্ (প্রশংসিত) (রহঃ)-এর রচনাবলীর প্রথম জিলদে বিংশ রচনায় ফারসী ভাষায় আছে, হযরত মুজাদ্দেদ (রহঃ) মির্জা হেছাম উদ্দীন-এর নিকট চিঠি পাঠাইয়াছিলেন। ঐ চিঠির মধ্যে হযরত মুজাদ্দেদ (রহঃ) মির্জা সাহেবকে পীর ভাই বলিয়া পরিষ্কার উল্লেখ করিয়াছেন। হিসাবে বুঝা যায় মির্জা সাহেব হযরত মুজাদ্দেদ (রহঃ)-এর মুর্শিদ হযরত খাজা মুহাম্মাদ বাকীবিল্লাহ (রহঃ)-এর খলিফা এবং হযরত খাজা সাহেবের খানকাহ্ পরিচালনার ভার তাহার উপরই ন্যস্ত থাকিত। ঐ চিঠির মধ্যে হযরত মুজাদ্দেদ (রহঃ) নিজের খাদেমদের জন্য দুআ লিখিয়াছেন। আর ঐ চিঠির মধ্যে মির্জা সাহেবের কোন কোন প্রশ্নের উত্তর লিখিয়া হযরত মুজাদ্দেদ (রহঃ)-এর মুর্শিদ গদ্দি সোপর্দ করিবার এবং তাঁহার স্থলাভিষিক্ত শাইখুল হেদাদকে নির্দিষ্ট করার কথা যাহা মির্জা সাহেব লিখিয়াছেন তাহার উত্তরে হযরত মুজাদ্দেদ (রহঃ) মির্জা সাহেবকে লিখিয়াছেন-

"শাইখুল হেদাদকে ইজাযত দিয়াছি আমার পক্ষ হইতে যাইয়া তাহাদিগকে তালীমের কাজে নিয়োজিত করিবে এবং তাঁহার অবস্থা আমাকে খবর দিবে। যদি ইহা তাঁহার মৃত্যুর পরে করিত তবে নিঃসন্দেহে উহা খেয়ানত সাব্যস্ত হইত। এই কথার দ্বারা আমার মনে ইহা সাব্যস্ত হইল যে, লোকদিগকে জায়গায় জায়গায় তালীমের জন্য পাঠান জায়েয আছে। যে ব্যক্তি সম্পূর্ণ খেলাফতের আশা করিবে তাহাকে মাশায়েখের মর্তবা হাসেল করিতে হইবে। হযরত মুজাদ্দেদ (রহঃ)-এর কথার ভাব

ভঙ্গিতে ইহা পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে যে, শাইখুল হেদাদের ইলমে আহ্কাম ও ইলমে আছরার হাসেল ছিল না এবং মাশায়েখের মর্তবার তিনটি বিষয় তাহার হাসেল ছিল না। হযরত মুজাদ্দেদ (রহঃ) عَوَارِفُ الْمَعَارِفِ এর অনুসারে বলিয়াছেন।

হযরত নিজাম উদ্দীন আউলিয়া (রহঃ)-এর বক্তব্য যাহা হযরত শেখ আবদুল হক মুহাদ্দেসে দেহলবী (আল্লাহ্ তাঁহাকে পবিত্র করুক)-এর রচনা 'আখ্বারুল-আখইয়ার'-এর মধ্যে লিখিয়াছেন-

হযরত নিজাম উদ্দীন আউলিয়া (রহঃ) বলিয়াছেন ঃ যখন খাজা অর্থাৎ শেখ ফরিদ উদ্দীন গঞ্জে শেখর আমাকে খেলাফত দিলেন এবং বলিলেন, আল্লাহ্ তাআলা তোমাকে ইলম, আকল এবং এশ্ক দিয়াছেন। যাহার মধ্যে উক্ত তিন সিফাত বিদ্যমান আছে সে মাশায়েখের খেলাফতের উপযুক্ত। আর তাহার দ্বারা এই কাম খুব হইবে। আর খাজা মুহাম্মাদ বাকীবিল্লাহের যে পদঁ-মর্যাদা তাহার বর্ণনা তাফসীরে 'ফতহুল আযিযী'-এর সূরায়ে 'আলাক'-এর তাফসীরে দেখ, কি রকম তাহার তাওয়াজ্জুহর মধ্যে জোর এবং প্রভাব ছিল, যাহার দরুন নানা ভাইকে এক ঘন্টার তাওয়াজ্জুহর মধ্যে নিজের মত করিয়া ফেলিলেন। বাতেনে তাঁহার মতই হইয়া গেল আর প্রকাশ্যে হযরত খাজার মত আকৃতি হইয়া গেল। হযরত খাজার মর্তবা তাহার রচনাবলী দ্বারা আর বুযুর্গদের লেখনীর ও বর্ণনার দ্বারা প্রকাশ পাইয়াছে এবং প্রসিদ্ধ হইয়াছে। আর তাঁহার মর্তবার হাকীকত তাঁহার মুর্শিদ হযরত খাজা মুহাম্মাদ বাকীবিল্লাহ (রহঃ)-এর লেখার দ্বারা আলোকিত হইয়াছে যাহা 'আখবারুল আখইয়ার'-এর সমাপ্তির মধ্যে কোন গ্রহণযোগ্য মুহাক্কেক লিখিয়াছেন-

হযরত খাজা বাকীবিল্লাহ (রহঃ) নিজের এক শুভাকাঙ্ক্ষীকে লিখিয়াছেন, শেখ আহ্মদ নামে একজন লোক আছে, সেরহিন্দের বাসিন্দা। তাঁহার খুব ইলম আছে আর সে ইলমের মধ্যে খুব শক্তিশালী। তিনি কিছুদিন ফকিরের সঙ্গে উঠা-বসা করিয়াছেন। তাঁহার কাজের শক্তির দিকে দৃষ্টি দিলে মনে হয় তিনি একটি সূর্য, সমস্ত পৃথিবীকে আলো দিতেছেন। আর হযরত খাজা মুহাম্মাদ বাকীবিল্লাহ এই কথাও বলিয়াছেন যে, শেখ আহমদ একটি সূর্য যেমন আমাদের হাজার তারকারাজী তাঁহার ছায়ার মধ্যে নিশ্চিহ্ন। খাজা সাহেবের বক্তব্য, হযরত মুজাদ্দেদ (রহঃ)-এর ফাযায়েল-এর মধ্যে বহু সংক্ষিপ্ত করার জন্য এখানেই সমাপ্ত করিলাম।

ঃ তামাম শোদ ঃ

পাঠকগণের আমলের সুবিধার্থে সম্মানিত গ্রন্থকার হযরত মাওলানা শাহ কারামত আলী জৌনপুরী (রহঃ) রচিত জাদুত তাকওয়া কিতাব থেকে এইটুকু সংযোজন করা হইল–[১]

একটি নিয়ম-পদ্ধিতি জিকিরের মাশায়েখগণের তরীকার সাদৃশ আওয়ারেফ কিতাবের পঞ্চাশ পরিচ্ছেদের সারমর্ম লিখিতেছি। উহা এই–ফজরের নামাযের পরে যেই স্থানে নামায পড়িয়াছে ঐ স্থানে কেবলাদিকে মুখ করিয়া বসিয়া থাকিবে। আর যদি ঐ স্থান হইতে সরিয়া এক নির্জন স্থানে বসিলে তাহার দ্বীনের কোন ফায়দা হয় তবে ঐ স্থান হইতে সরিয়া এক নির্জন স্থানে বসিবে যাহাতে কারো সঙ্গে কথা বার্তা বলিবার অবকাশ না হয় এবং কোন দিকে দেখিবার সুযোগ না হয়, কেননা ঐ সময় আরামে চুপচাপ বসিতে এবং কথাবার্তা না বলিবার মধ্যে পরিস্কার খোলাখুলি প্রভাব আছে। আর প্রভাবকে লেনদেনকারী এবং দেলওয়ালা লোক বুঝিতে পারে। আর রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এইরূপ অভ্যাস ছিল। আওয়ারেফের মধ্যে উহার পর কোরআন শরীফের কিছু আয়াত পৃথক পৃথক লিখিয়াছে উহা পড়িবে। তারপর সোবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার লিখিয়াছে। যেহেতু এই আয়াতসমূহ পড়া জরুরী নয় আর প্রত্যেকের জন্য উহা পড়া সম্ভবও নয়। আর আসল উদ্দেশ্য এসময় তেলাওয়াত এবং আল্লাহর যিকির করা। অতঃপর নিজের নামাযের স্থানে কিংবা নিজের স্থানে যেখানে সম্ভব হয় কেবলাদিকে মুখ করিয়া বসিয়া পড়িবে সোবহানাল্লাহ তেত্রিশবার, আলহামদুলিল্লাহ তেত্রিশবার, এবং আল্লাহু আকবার তেত্রিশবার এবং একবার নিম্নলিখিত দুআ পড়িবে এবং একশতকে পুরা করিবে।

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِىْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ـ

উচ্চারণঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা-শারীকা লাহু লাহুল মুল্‌কু ওয়া লাহুল্ হামদু ইউহ্‌য়ী ওয়া ইউমীতু ওয়া হুয়া 'আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর।

অর্থঃ আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবূদ নাই তাঁহার কোন শরীক নাই। রাজত্ব তাঁহারই। তাঁহার জন্য সমস্ত প্রশংসা। তিনি জীবিত করেন এবং মৃত্যু দান করেন। সমস্ত কিছুর উপর তিনি সম্পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন।

---

১. প্রকাশক-আলহাজ্জ আবূ নাঈম মোহাম্মদ আবদুল আলীম (বুলবুল) এডভোকেট কর্তৃক এই অংশ শেষ পর্যন্ত সংযোজন করা হইল।

তারপর কোরআন মজিদ তেলাওয়াতের মধ্যে হেফজ হউক কিংবা কিতাব দেখিয়া হউক কিংবা যে প্রকারের যিকির হউক উহার মধ্যে মশগুল থাকিবে কোন প্রকার ভুলত্রুটি করিবেনা এবং নিদ্রা যাইবে না কেননা ঐ সময় নিদ্রা যাওয়া নিশ্চয়ই মাকরূহ। আর যদি নিদ্রা অত্যধিক পরিমাণে বেশী হইয়া যায় তবে নিজের মছল্লার (জায়নামায) মধ্যে কেবলার দিকে মুখ করিয়া কয়েক পা পিছনে সরিবে। কেননা ঐ সময় সোজাসুজি কেবলার দিকে মুখ করিবার মধ্যে এবং কথাবার্তা না বলিবার মধ্যে নিদ্রা না যাওয়ার মধ্যে এবং সোজাসুজি যিকির করিবার মধ্যে খুব আছর (প্রভাব) আছে এবং খুব বরকত আছে। 'আওয়ারেফ' লেখক লিখিতেছেন– আমি আলহামদু লিল্লাহির এই প্রভাব এবং বরকত পাইয়াছি এবং আল্লাহ্র অন্বেষণকারীগণকে আমি অসিয়ত করিতেছি। যে ব্যক্তি যিকিরে কালবী এবং যিকির লেসানীকে এই সময় একত্র করে, উহার মধ্যে অনেক প্রভাব আছে এবং খুব প্রকাশ পাইবে। এই অধম এই সময় উল্লেখিত তাসবীহের পরে কিছু মাছনূন দুআ এবং চার কুল পড়িয়া নকশবন্দিয়া তরীকার শোগল করিতে থাকে। অতঃপর সূর্য উদিত হইবার নিকটবর্তী সময় ছাবআতে আশার পড়ে উহার মধ্যে যিকিরে কালবী ও যিকিরে লেসানী একত্র হইয়া যায়। আর এই সময় যেহেতু দিনের প্রথম।

আর দিনের মধ্যে বিপদ-আপদ ইত্যাদি আসার ধারণা থাকে। যদি দিনের প্রথমভাগে সেই দিকে লক্ষ্য করিয়া ঠিক এবং মজবুত থাকে তাহা হইলে সে দিনের ভিত্তিকে ঠিক এবং মজবুত করিল, কাজেই দিনের সমস্ত বিষয়গুলি ঐ ভিত্তির উপর ঠিক হইয়া যাইবে। আর যখন সূর্য উদিত হইবার সময় নিকটবর্তী হয়, তখন মোছাব্বিআত আশার পড়া আরম্ভ করিয়া দিবে। আর মোছব্বিআতে আশার হযরত খিযির (আঃ)-এর তালিম। তিনি ইব্রাহিম তাইমী (রঃ) যিনি ওলামায়ে তাবেঈনদের মধ্যে ছিলেন শিক্ষা দিয়াছিলেন। আর হযরত খিযির (আঃ) বলিয়াছেন, আমি উহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হইতে শিখিয়াছি। যে ব্যক্তি উহাকে সর্বদা পড়িবে সে ব্যক্তি অন্যান্য দুআ ও যিকিরের মধ্যে যে ফায়দা পাইতে উহার সমস্ত এই মোছাব্বেআতে আশার এর মধ্যে পাইবে। মোছাব্বিআতে আশার দশটি জিনিস উহার প্রত্যেকটি সাত সাত বার করিয়া পড়িতে হইবে, উহা এই-সূরায়ে ফাতিহা সাতবার, কুল আউজু বিরাব্বিন নাছি সাতবার, কুল আউজু বিরাব্বিল ফালাক সাতবার; কুলহুওয়াল্লাহু আহাদ সাতবার, কুল ইয়া আয়্যুউহাল কাফিরূন সাতবার, আয়াতুল কুরসী সাতবার, সোবহানাল্লাহি ওয়াল হামদু লিল্লাহি ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার সাতবার, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদিন সাতবার, আল্লাহুম্মাগ্ফিরলী ওয়ালি ওয়ালিদাইয়া ওয়া লিল মু'মিনীনা ওয়াল মু'মিনাতি সাতবার। আর,

اَللّٰهُمَّ افْـعَلْ بِىْ وَبِـهِمْ عَـاجِـلاً وَّاٰجِـلاً فِى الدِّيْنِ وَالدُّنْيَـا وَالْاٰخِرَةِ مَـا اَنْتَ لَهٗ اَهْلٌ وَلاَ تَفْعَلْ بِنَا يَا مَوْلاَنَـا مَا نَحْنُ لَهٗ اَهْلٌ اِنَّكَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ جَوَادٌ كَرِيْمٌ بَرٌّ رَّؤُوْفٌ رَّحِيْمٌ -

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মাফ্আল বি ওয়া বিহিম আ'জিলান ওয়া আ'জিলান ফিদ্দিনি ওয়াদ্দুন্ইয়া ওয়াল আখিরাতি মা আনতা লাহু আহ্লুন ওয়ালা তাফ্আল বিনা ইয়া মাওলানা মা নাহ্নু লাহু আহ্লুন ইন্নাকা গাফুরুর হালিমুন জাওয়াদুন কারিমুন বার্রুর রাঊফুর রাহীম।

অর্থঃ "হে আল্লাহ্! তুমি আমার সঙ্গে এবং আমার পিতামাতার সঙ্গে আর মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন স্ত্রী-লোকদের সঙ্গে তাড়াতাড়ি হউক কিম্বা দেরিতে হউক দুনিয়া এবং আখেরাতে এমন কাজ কর তাহারা যে কাজের উপযুক্ত। হে প্রভূ! তুমি আমাদের প্রতি এমন কাজ করিও না যাহার আমরা অনুপযুক্ত। হে প্রভূ! তুমি আমাদের প্রতি এমন কাজ করিও না যাহার আমরা অনুপযুক্ত। তুমি ক্ষমাকারী, ধৈর্যশীল, আধ্যাত্মিক দাতা; দয়ালু, দানশীল এবং পরম দয়ালু।

হযরত ইব্রাহীম তাইমী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি হইতে বর্ণিত আছে, তিনি হযরত খিজির আলাইহি ওয়া সাল্লাম হইতে শিক্ষার পর যখন মোছাব্বিআতে আশার পড়িলেন, তখন স্বপ্নে, দেখিলেন, তিনি বেহেশতে গিয়াছেন, সেখানে ফেরেশতা ও নবীগণকে দেখিলেন এবং বেহেস্তের খানা খাইলেন। বর্ণিত আছে তিনি চার মাস পর্যন্ত কোন খানা খান নাই কিম্বা লোকেরা এইরূপ বলিয়াছে যে, তাহার খানা না খাওয়ার কারণ সম্ভবতঃ বেহেশ্তের খানা খাওয়া অতঃপর যখন মোসাব্বেআতে আশার হইতে অবসর হইলেন, তখন সোবহানাল্লাহ এবং আসতাগ্ফিরুল্লাহ পড়িতেন এবং তেলাওয়াতের মধ্যে দীর্ঘ সময় লিপ্ত থাকিতেন এমনকি এক নেজা পর্যন্ত সূর্য উপরে উঠিয়া যাইত। এবং ঐ জায়গা হইতে উঠিবার পূর্বে দুই রাকাআত নামায পড়িতেন। বাকী পাঁচ ওয়াক্তের দুআ এবং তাসবীহ যাহা আওয়ারেফ কিতাবে আছে যদি আল্লাহ্ তাআলা তাওফীক দেয় তবে ইনশাল্লাহ পরে কোন রেসালার মধ্যে পৃথকভাবে লিখিব। সকাল সন্ধ্যায় যিকিরের জন্য এই পর্যন্তই যথেষ্ট। অতঃপর যখন দিন শেষ হইতে আরম্ভ করিল, তখন রাত্রের অভ্যর্থনার জন্য অজুর মাধ্যমে প্রস্তুত হইয়া যাইবে আর সূর্যাস্তের পূর্বেই মোছাব্বেআতে আশার পড়িবে এবং তাসবিহ ও এস্তেগফার পড়িতে থাকিবে। এমন সময় পড়িতে আরম্ভ করিবে যে মোছাব্বেআতে আশার পড়িয়া তাসবীহ, এস্তেগফার-এর মধ্যে মাশগুল হইবে এবং এখনও সূর্য বাকী আছে। এবং সূর্য অস্ত যাইবার সময়

وَالشَّمْسِ এবং وَالَّيْلِ এবং কুল আউজু বিরাব্বিল ফালাক ও কুল আউজু বিরাব্বিন নাস পড়িবে। আর যে প্রকারে আল্লাহ্ তাআলার যিকিরের দ্বারা দিনের অভ্যর্থনা করিয়াছে সেইরূপ রাত্রেও অভ্যর্থনা করিবে।

সকাল সন্ধার আমল

তালেবে সাদেক (সত্য সন্ধানী)-এর উচিৎ যে, প্রত্যহ ৩১৩ বার অথবা ৭৮৬ বার بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পড়বে। ১০০০ বার لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ পড়িবে, اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ ১০০০ বার পড়িবে, سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ পড়িবে ১০০০ বার। ১১০০ বার পড়িবে يَا مُغْنِيْ এবং يَا وَهَّابُ ৩১৩ বার পড়িবে। বর্ণিত আমলগুলি সকাল থেকে সন্ধ্যার মধ্যে করিতে হইবে। ফজরের নামাযের পর প্রত্যহ একবার সূরায়ে ইয়াসীন পড়িবে। আর প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যায় الٓمّٓ থেকে مُفْلِحُوْنَ পর্যন্ত পড়িবে। আয়াতুল কুরসী خَالِدُوْنَ পর্যন্ত একবার পড়িবে। اٰمَنَ الرَّسُوْلُ থেকে সূরায়ে বাকারার শেষ পর্যন্ত অবশ্যই একবার পড়িবে। তাহা হইলে সে এবং তাহার পরিবারবর্গ দুর্ভিক্ষসহ সর্ব প্রকার খারাবী থেকে বাচিয়া থাকিবে ইনশাআল্লাহ্। আর ইশার নামাযের পর সূরায়ে মুল্‌ক একবার ও সূরায়ে ওয়াকেয়া একবার পড়িবে এবং ঘুমানোর পূর্বে ১০০০ বার অথবা ৫০০ বার নিম্নের দু'আ পড়িবে।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَسَلِّمْ

সমাপ্তি দুআ

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَسْئَلُكَ بِاَنَّكَ مَالِكِيْ وَسَيِّدِيْ وَمَوْلَايَ وَثِقَتِيْ وَرَجَائِيْٓ اَسْئَلُكَ بِحُرْمَةِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْبَلَدِ الْحَرَامِ وَالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَقَبْرِ نَبِيِّكَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَنْ تَهَبَ لِيْ مِنَ الْخَيْرِ مَا لَا يَعْلَمُ عِلْمَهٗٓ اِلَّآ اَنْتَ وَتَصْرِفَ عَنِّيْ مِنَ السُّوْٓءِ مَا لَا يَعْلَمُ عِلْمَهٗٓ اِلَّآ اَنْتَ ـ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَآءِ ـ رَبَّنَا اغْفِرْلِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ ـ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰٓى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ ـ